জরুরী কয়েকটি দাবি নিয়ে আলোচনায় বসতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র দিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

পত্র নং ঃ কো-অর্ডি - ৪৬/১৪ কলকাতা, তারিখ ঃ ২৭ জুন, ২০১৪

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ

মহাশয়া,

আপনাকে বিনয়ের সাথে অবহিত করছি যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই আপনি রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনগুলির সভায় সংগঠন করার এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার অক্ষুন্ন রাখার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের জানিয়েছিলেন এবং প্রতি তিনমাস অন্তর সংগঠনগুলির সাথে প্রশাসনিক কাজ ও কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দিয়েছিলেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ, যন্ত্রণা ও ক্ষোভের সাথে জানাচ্ছি যে উল্লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলির একটিও আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি, শুধু দুটিমাত্র স্বল্পকালীন সভা ছাড়া। বরং ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতন্ত্রের প্রতি আক্রমণ বেড়েছে।

ব্যাপকভাবে চলছে দমন-পীড়নের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নীতিহীন বদলী। আমলারা কোনো প্রশাসনিক নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে নির্বিচারে বদলী করছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রীমহোদয়গণ প্রশাসনের হাত থেকে বদলীর ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন। প্রশাসনের অভ্যন্তরে একটা ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা কিনা সমগ্র কর্মচারী সমাজ ও তাঁদের পরিবারকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে। এর ফলে নষ্ট হয়েছে দপ্তরের কাজের পরিমণ্ডল।

সাথে সাথে কর্মচারীদের আর্থিক বঞ্চনার দীর্ঘ পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে আপনার প্রাক্ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি আজও কার্যকরী হয়নি। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা আজ সবচাইতে কম বেতন পান। মহার্ঘভাতা বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশ। প্রশাসনের সর্বনিম্নস্তরের একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারী এই মূল্যবৃদ্ধির বাজারে প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা থেকে ৪ হাজার টাকা বেতন কম পাচ্ছেন। গ্রুপ-সি কর্মচারী থেকে বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ মাসে ৬ হাজারথেকে ২৭ হাজার টাকা কম পাচ্ছেন। তাছাড়া পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় অংশের সুপারিশসমূহ এবং কারিগরী কর্মচারীদের জন্য তৃতীয় অংশের কর্মচারী স্বার্থবাহী (অমিতাভ চ্যাটার্জী কমিটি) সুপারিশসকল এখনও কার্যকরী হয়নি। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কর্মচারীদের জন্য ইতোমধ্যে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করেছেন। সেই মতো আমরা রাজ্য সরকারের কাছে ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছি এবং এ ব্যাপারে পুনরায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই সমস্ত বিষয়ে আপনার সক্রিয় হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি আমরা দ্রুত একটি দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চাইছি। আশা করি আপনি সহৃদয়ে, সহানুভূতির সঙ্গে তা বিবেচনা করে আমাদের সংগঠনকে একটি আলোচনার দিন ও সময় ধার্য্য করে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি মর্যাদা প্রদান করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়

(মনোজ কান্তি গুহ)
সাধারণ সম্পাদক

অন্যান্য রাজ্যগুলির প্রাপ্ত মহার্ঘভাতার চিত্র

রাজ্য	প্রাপ্য মহার্ঘভাতা %	রাজ্য	প্রাপ্ত মহার্ঘভাতা %
বিহার	১০০	তামিলনাড়ু	১০০
আসাম	১০০	জম্মু ও কাশ্মীর	৯০
উড়িষ্যা	১০০	তেলেঙ্গানা	১০০
অন্ধ্রপ্রদেশ	১০০	কেরালা	১০০
হরিয়াণা	১০০	রাজস্থান	১০০
পাঞ্জাব	৯০	মহারাষ্ট্র	১০০
ঝাড়খণ্ড	১০০		

১২ই জুলাই কমিটি প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচী
আলোচনা সভা

স্থান ঃ
ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চ (বাগবাজার, উত্তর কলকাতা)
১৪ জুলাই, ২০১৪ ● বিকেল ৫.৩০টায়
বক্তা ঃ
ডঃ সূর্যকান্ত মিশ্র (বিধানসভার বিরোধী দলনেতা)
বিষয় ঃ
বর্তমান পরিস্থিতি ও শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের করণীয়

রাজ্য সরকারের অনীহায় মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২, দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলি। ঐ ধর্মঘট আহুত হয়েছিল মূলত কেন্দ্রের তৎকালীন ইউপিএ-২ সরকারের জনস্বার্থবিরোধী ও শ্রমিক-কর্মচারীস্বার্থ বিরোধী নীতিসমূহ প্রত্যাহারের দাবিতে। এতদ্‌সত্ত্বেও বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার ধর্মঘটের কয়েকদিন আগে একটি সার্কুলার জারি করে, যেখানে বলা হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি '১২ সকলকেই অফিসে আসতে হবে। কোনো কারণেই কোনো কর্মচারীকে ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই সার্কুলারটা ছিল সম্পূর্ণই ব্যতিক্রমী। কারণ অতীতে (বামফ্রন্টের আমলে) যে কোনো ধর্মঘটের পূর্বে যখন কোনো সার্কুলার দেওয়া হত, তাতে বলা হত ধর্মঘটের দিন অফিস-দপ্তর সমস্ত কিছু খোলা থাকবে। কিন্তু যদি কোনো কর্মচারী কোনো কারণে ঐ দিন অফিসে না আসতে পারেন, তাহলে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে ছুটির দরখাস্ত করতে হবে। অর্থাৎ কোনো কারণেই কোনো ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না, একথা অতীতে কখনও কোনো সরকারী সার্কুলারে বলা হয় নি। ২৮ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটের কয়েকদিন পরে (৬ মার্চ ২০১২) আরও একটি সরকারী আদেশনামা প্রকাশিত হয় যেখানে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ করে বলা হয়, শুধুমাত্র ঐ কয়েকটি কারণেই যদি কোনো কর্মচারী ২৮ ফেব্রুয়ারি অফিসে উপস্থিত হতে না পারেন, তাহলেই শুধুমাত্র ছুটি মঞ্জুর করা হবে। এই কারণগুলি ছাড়া আর অন্য কোনো সমস্যা বা অসুবিধা অনুমোদিত হবে না, এবং অনুপস্থিত কর্মচারীদের একদিনের বেতন কাটা হবে এবং ডাইস্-নন করা হবে। অর্থাৎ ঐ দিনটি অনুপস্থিত কর্মচারীদের চাকরি জীবন থেকে বাদ যাবে।

রাজ্য সরকারের উপরোক্ত অগণতান্ত্রিক সার্কুলারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অর্থ দপ্তরের কর্মচারী বিজয় শংকর সিনহা এবং পূর্ত দপ্তরে কর্মরত প্রভঞ্জন ঘোষ স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালে (স্যাট) দুটি মামলা দায়ের করেন। দুটি মামলার নং হল যথাক্রমে অরিজিনাল অ্যাপ্লিকেশন (ওএ) নং ১৫৯/২০১৩ এবং ১৪৬৬ /২০১৩। মামলা দুটি দায়ের করার পূর্বে তাঁরা ২৮ ফেব্রুয়ারি দপ্তরে অনুপস্থিতির জন্য ব্যক্তিগত কারণে ক্যাজুয়াল লিভ-এর আবেদন করেছিলেন। সরকার তাঁদের আবেদন না মঞ্জুর করে বেতন কাটার নির্দেশ দেয়। ঐ নির্দেশই অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক, ফলে বাতিলযোগ্য এই আবেদন নিয়েই তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন।

কিন্তু ট্রাইবুনালে বিভিন্ন সময়ে মামলাটির শুনানির দিন ধার্য হলেও, বারবার তা স্থগিত হতে থাকে। এর মূল কারণ স্যাট্-এর দুই জন বিচারপতির এজলাসে, একজন বিচার বিভাগের প্রতিনিধি এবং অপরজন প্রশাসনের প্রতিনিধি। স্যাট্-এ একজন বিচারপতির কোনো এজলাস নেই। স্যাট্-এ বেশ কিছুদিন ধরেই প্রশাসনের একজন প্রতিনিধিই বিচারপতি হিসেবে ছিলেন। তিনি হলেন শ্রী সমর ঘোষ মহাশয়। শ্রী সমর ঘোষ মহাশয়ই রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব হিসেবে উপরোক্ত অগণতান্ত্রিক সার্কুলার জারি করেছিলেন। যার ভিত্তিতেই বিজয়শংকর সিনহা ও প্রভঞ্জন ঘোষের বেতন কাটা হয় এবং তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন। স্বভাবতই শ্রী সমর ঘোষ এই মামলাটির শুনানি গ্রহণ করতে ব্যক্তিগত কারণে অস্বীকার করেন। ফলে প্রশাসনের দ্বিতীয় প্রতিনিধি না আসা পর্যন্ত মামলাটির শুনানি বারবার পিছিয়ে যেতে থাকে।

অবশেষে শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী (বিচার বিভাগ) এবং ডঃ অনুপ কুমার চন্দ (প্রশাসন)-এর এজলাসে মামলা দুটির শুনানি শুরু হয়। ৯ জুন ও ১৬ জুন এই দুই দিনই দুটি মামলার শুনানি হয়। আবেদনকারী দুজন কর্মচারীর পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রী তরুণ রায় জোরালো সওয়াল করেন। দীর্ঘ সুত্রিতার কারণে মামলা দুটির গুরুত্ব যে লঘু হয়ে যাচ্ছে, তাও তিনি উল্লেখ করেন। সরকার পক্ষের আইনজীবী কার্যত নীরবই ছিলেন। পাল্টা কোনো জোরালো সওয়াল তাঁর মুখে শোনা যায় নি। এমনকি ইতিপূর্বে সরকারের লিখিত বক্তব্য (এফিডেভিট ইন অপজিশন) জানানোর জন্য আদালত যে ছ'সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল, সরকার সেই সময়সীমা লঙঘন করে প্রায় ছ'মাস পরে তাঁদের বক্তব্য জানায়। তবুও কোনো রায় ঘোষণা না করে আদালত পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে ২৫ আগস্ট'এবং ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪। □

ভিতরের পৃষ্ঠায়

● বিশ্বকাপ ফুটবল ● নজরুল ● আইজ্যাক নিউটন ● বিশ্ব পরিবেশ দিবস ● ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ প্রসঙ্গে

বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে শ্রমিক কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিল

গত ১১ জুন "বন্ধ কারখানা খোল"—এই দাবিতে রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীরা বিক্ষোভ মিছিল করলেন। ঐদিন কলকাতার ধর্মতলার ওয়াই রোড থেকে কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত এক সুবিশাল মিছিলে সামিল হয়েছিলেন সমগ্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, কর্মচারী ফেডারেশন ও ১২ই জুলাই কমিটি।

রাজ্য জুড়ে একটার পর একটা শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জেশপ, হিন্দমোটর, ডাকব্যাক, ডানলপের মতো বড় কারখানার পাশাপাশি বহু ছোট ও মাঝারি কারখানাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিও একের পর এক বন্ধ হচ্ছে। এমন অসহনীয়পরিস্থিতিতেই রাজ্য সরকারের দায়িত্ব রয়েছে কারখানা খোলার উদ্যোগ নেওয়ার। কিন্তু রাজ্য সরকার সে পথে হাঁটছে না। কিন্তু শ্রমমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী দাওয়াই দিচ্ছেন বন্ধ কারখানার সম্পদ বিক্রী করে শ্রমিক কর্মচারীদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হোক।

লোকসভা নির্বাচন শেষ হতে না হতেই রাজ্যে একের পর এক কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হতে শুরু করে। টিকে থাকা শিল্পগুলিও ধুঁকতে ধুঁকতে বন্ধ হওয়ার উপক্রম। শাসক দলের মদত নিয়েই কারখানার মালিক ও কর্তৃপক্ষ শ্রমজীবীদের সামাজিক সুরক্ষাগুলি কেড়ে নিচ্ছে। এমন বিপন্ন পরিস্থিতিতেই রাজ্যের সবকটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও কর্মচারী ফেডারেশনগুলি এক মঞ্চে মিলিত হয়েছিল গত ৩ জুন। সেদিন কেন্দ্রীয় কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমগ্র শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ দরকার। সেই কারণেই ১১ তারিখের মিছিলে আই এন টি ইউ সি-ও যোগদান করেছিল। □

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন ও ১২ই জুলাই কমিটির যৌথ কনভেনশন

হিন্দ মোটর, জেশপ, ডানলপ, ডাকব্যাক এবং রাজ্যের বন্ধ হয়ে যাওয়া চটকল, সুতাকল সহ সমস্ত কারখানা ও বন্ধ চা বাগানগুলি খোলার দাবিতে ৩ জুন ২০১৪ অফিস ছুটির পর কলকাতায় সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশনসমূহ ও ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কনভেনশনে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের শপথ গ্রহণ করা হল।

এই কনভেনশন পরিচালনা করার জন্য শ্যামল চক্রবর্তী, কুমারেশ চন্দ্র কুণ্ডু, দীপক সাহা, নরেন চ্যাটার্জী, এ এল গুপ্ত, তপন ঘোষ, জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতনু চক্রবর্তী এবং সমীর ভট্টাচার্যকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সভার শুরুতেই সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী এই সময়কালে প্রয়াত বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী নেতৃত্ব এবং সমাজের বিশিষ্টজনের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন করেন এবং সভা এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। তিনি বলেন রাজ্যের ভারী-মাঝারি শিল্পগুলি ধারাবাহিকভাবে বন্ধ হয়ে চলেছে। চটকলগুলি অধিকাংশই বন্ধ, যেগুলি খোলা সেখানে শ্রমিকদের কর্মদিবস কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চা বাগানে আশাতীত লাভ হলেও খেয়াল খুশিমতো বাগান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারীদের রুটি রুজির উপর এই আক্রমণের পাশাপাশি রাজ্যের শাসকদলও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির উপর নানা প্রক্রিয়ায় হামলা ও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। একে মোকাবিলা করতে পারে একমাত্র ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন। নতজানু হয়ে রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী সন্ত্রাসের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না বরং ঐক্যবদ্ধ

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
জুন ২০১৪
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৩তম বর্ষ □ দ্বিতীয় সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

জনস্বার্থবাহী বিকল্পই প্রকৃত বিকল্প

যে সময়টায় প্রায় প্রতিদিনই প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের প্রথম পাতার প্রধান হেড লাইনটি মেসি, নেইমার, রোনাল্ডো বা ম্যুলারের দখলে, সেই সময়ে হঠাৎই ২১ জুন প্রভাতি দৈনিকগুলির শিরোনাম দখল করে নিল নব নির্বাচিত 'মোদি সরকার'-এর বহুল বিজ্ঞাপিত 'আচ্ছে দিন আনে ওয়ালে হ্যায়'-এর প্রথম 'নমুনা'। এই একটা দিনের জন্য অন্তত মেসি, নেইমাররা সাইড লাইনের ধারে। নমুনাটি হল রেলের যাত্রী ভাড়া ও পণ্য পাশুল এক ধাক্কায় অনেকখানি বৃদ্ধি। প্রায় নজিরবিহীন এই বৃদ্ধির পরিমাণ যাত্রী ভাড়ার ক্ষেত্রে ১৪.২ শতাংশ এবং পণ্য মাশুল-এর ক্ষেত্রে ৬.৫ শতাংশ। আর একথা বোঝার জন্য অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজন নেই যে পণ্যমাশুল বৃদ্ধি পাওয়া মানেই হল সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আরও একদফা বাড়বে। এমনিতেই যখন খাদ্যশস্য সহ প্রায় সব জিনিসের দামই উর্ধ্বমুখী, তখন পণ্য মাশুল বাড়ানো মানেই হল 'গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া'। যাত্রী ভাড়া বাড়লে, যাঁরা ট্রেনে ভ্রমণ করেন, তাঁদের ওপর বোঝা চাপে। আর পণ্য মাশুল বাড়লে, যাঁরা কস্মিনকালেও ট্রেনে ওঠার সুযোগই পাননি, তাঁদেরও ভোগান্তি হয়। এক কথায়, দেশের প্রায় সব অংশের মানুষেরই (অবশ্যই আম্বানি, আদানি, টাটা, বিড়লাদের মতো কিছু ধনকুবের ছাড়া) ক্ষতি বৈ লাভ হবে না মোদি সরকারের এই সিদ্ধান্তে। আবার শুধু দাম বাড়ানো হল তা-ই নয়। কখন বাড়ানো হল? যখন আর কিছুদিনের মধ্যেই সংসদে রেল বাজেট পেশ করতে হবে নতুন সরকারকে। এর মধ্য দিয়ে সংসদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গণতান্ত্রিক রীতিকেও উপেক্ষা করা হল। অথচ এঁরাই কিছুদিন আগে পর্যন্ত যখন সংসদে বিরোধী আসনে বসতেন, তখন সরকার পক্ষ সংসদকে এড়িয়ে প্রশাসনিক আদেশ বলে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তৎকালীন শাসক জোটের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করতেন। আর আজ ক্ষমতায় বসে তাঁরাই মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ভোল পাল্টে ফেলে আইনসভাকে বুড়ো আঙুল দেখালেন।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এমন তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের কারণ কি? মোদি সরকারের যিনি প্রধান মুখ, যাঁকে গদীতে বসাতে মরীয়া কর্পোরেট লবি প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা (আনুমানিক) ঢেলেছে, সেই নরেন্দ্র মোদিজী মাত্র কয়েকদিন আগেই সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর বিতর্কে অংশ নিতে গিয়ে কত ভালো ভালো কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন বিরোধীদের পরামর্শ ও মতামতকে সবসময়ে গুরুত্ব দিয়েই তিনি সরকার চালাতে চান। বলেছিলেন, সংখ্যার জোরে (লোকসভায়, রাজ্যসভায় সেই জোর নেই) কোনো প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়া নয়। তাঁর লক্ষ্য হবে সকলের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে সর্বোত্তম পথে অগ্রসর হওয়া। তাহলে কার্যক্ষেত্রে তেমন ঘটল না কেন? সরকার পক্ষ যদি মনে করে ভারতীয় রেলকে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে বাঁচানোর একমাত্র দাওয়াই ভাড়া বৃদ্ধি, তাহলে সেই প্রস্তাবই তাঁরা রেল বাজেট পেশ করার সময়েই রাখতে পারতেন। রেল পরিষেবার বেহাল অবস্থার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে আর বিশেষ কোনো অবনতি হত না। কিন্তু লাভ যেটা হত তা হল, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলি এই বিষয়ে তাঁদের মতামত জানাতে পারতেন। সাম্প্রতিককালে যাঁরা রেল মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন, তাঁদের কোন্ কোন্ বালখিল্যসুলভ সিদ্ধান্তের জন্য ভারতীয় রেল এই দশায় পৌঁছল তাও সম্ভবত আলোচনায় উঠে আসার সুযোগ পেত। ভাড়ার হার বৃদ্ধির প্রশ্নে, সংশোধিত ভাড়ার বিন্যাস এমন করা যায় কিনা যাতে দরিদ্রতম মানষের ওপর নতুন করে কোনো বোঝা না চাপে, তাও সম্ভবত আলোচনায় উঠে আসত। কিন্তু আইনসভাকে এই ভূমিকা পালনের কোনো সুযোগ 'মোদি সরকার' দিল না।

অবশ্য মোদি সরকারের কথা ও কাজের এই ফারাক দেখে (সবে তো কলির সন্ধ্যা, গোটা রাত এখনও বাকি) ভারতবাসী খুব বেশি আশ্চর্য যে হন নি তা হলফ করে বলা যায়। কারণ স্বাধীনোত্তর গোটা পর্ব জুড়েই কেন্দ্রীয় শাসক দলগুলির এটিই দস্তুর। নির্বাচনের আগে আকণ্ঠ জনদরদী, নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের প্রথম লাইন থেকে শেষতম লাইনটি পর্যন্ত ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি আর নির্বাচন মিটে গেলেই জনগণের পিঠে ছুরি মারা শুরু। একেবারে জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি সকলেই এই পথের পথিক।

জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, সমস্ত কালোবাজারি-মজুতদারদের ল্যাম্প পোস্টে ঝুলিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে। বাস্তবে হয়নি। কালোবাজারি আর মজুতদারেরা বহাল তবিয়তে এখনও আছে শুধু নয়, আরও ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। যেমন এই নিবন্ধ লেখার সময় খবর পাওয়া গেল পেঁয়াজের কিলো প্রতি দাম আরও এক দফায় কৃত্রিমভাবে বাড়ানোর জন্য কালোবাজারি মজুতদারেরা পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। জওহরলাল তনয়া শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন 'গরীবী হঠাও'। কিন্তু গরীবী যে হটেনি তার প্রমাণ কেন্দ্রীয় সরকারেরই ডঃ অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট। যেখানে বলা হয়েছে আমাদের দেশের প্রায় ৭৭ ভাগ মানুষের দৈনিক রোজগার মাত্র কুড়ি টাকা বা তারও কম। অর্থাৎ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ভয়াবহ দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধীর 'গরীবী হঠাও' স্লোগান উত্থাপনের চার দশক পরেও। তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একাধিকবার ক্ষমতায় এলেও গরীবী হঠাও-এর প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই থেকে গেছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দেশের মানুষের একই অভিজ্ঞতা রাজীব গান্ধী, মনমোহন সিং এবং অটল বিহারী বাজপেয়ির জমানাতেও। নতুন নতুন মোড়কে প্রতিশ্রুতি বাজারে এসেছে, কিন্তু আম-জনতার জীবনমানের কোনো হেরফের ঘটেনি।

স্বাধীনতার পর সব মিলিয়ে সাত-আটটা বছর বাদ দিলে বাকি সময়টা কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকেছে হয় কংগ্রেস না হয় বিজেপি। এককভাবে অথবা কয়েকটি আঞ্চলিক দলকে সাথে নিয়ে জোট গড়ে। তাই সাধারণ মানুষের জীবনের পাহাড় প্রমাণ সমস্যার জন্য দায়ি যে মূলত এই দুটি দলই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই তালিকায় নবতম সংযোজন হল বি জে পি'র প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি—নির্বাচনের আগে যাঁর 'লার্জার দ্যান লাইফ' ইমেজ তৈরি করা হয়েছিল। মোদিজীও খুব ঘটা করে বলেছিলেন, জিনিসের দাম কমানো হবে। কিন্তু ক্ষমতায় বসেই তিনি প্রথম যে কাজটা করলেন, তাতে জিনিসের দাম কমা তো দূরের কথা আরও বাড়বে। পাশাপাশি জাত-ধর্ম-বর্ণ-অঞ্চল নির্বিশেষে সর্বজনীন ডেভেলপমেন্টের প্রতিশ্রুতিও তিনি নির্বাচনের আগে দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় বসেই তিনি যা বলেছেন তা হল বছর দুই-তিনেক এখন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, জনগণকে কষ্ট করতে হবে। ফল যা ফলার তা নাকি তার পরে ফলবে!

কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় দলের আমলেই সাধারণ মানুষের সমস্যার কোনো সুরাহা না হলেও, উপর্যুপরি নির্বাচনগুলিতে মানুষ এই দুটি দলকেই কোনো না কোনো সময়ে উজাড় করে ভোট দিয়েছে। কেন? আসলে এর বাইরে তেমন কোনো বিকল্প কেন্দ্রীয়ভাবে মানুষের নজরে আসে নি। রাজ্যে রাজ্যে বহু রাজনৈতিক বিকল্প থাকলেও, গোটা দেশ জুড়ে তার সম্প্রসারণ ঘটে নি। মাঝে কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু চেষ্টা হয়েছে (যেমন জনতা পার্টি বা ন্যাশনাল ফ্রন্ট) কিন্তু হয় অভ্যন্তরীণ না হয় বাহ্যিক কারণে সেগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ফলে উপযুক্ত বিকল্পের অভাবে, বার বার আশাহত হয়েও মানুষ এই দুটো দলকে ধরে নতুন করে আশার আলো দেখতে চেয়েছেন।

দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকলেও, গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশক থেকে কেন্দ্রে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে তা কার্যত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। উত্তরণ যতটুকু ঘটেছে তা হল দ্বি-দলীয় থেকে দ্বি-জোটের ব্যবস্থায় রূপান্তর। এতে সরকারের কাজের অভিমুখের তেমন কোনো গুণগত পরিবর্তন না ঘটলেও, কখনও কখনওস্বেচ্ছাচারিতায় কিছুটা লাগাম পরানো সম্ভব হয়েছিল (যেমন বামপন্থীদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল ইউ পি এ-১ সরকার)। কিন্তু ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনের প্যাটার্নের এই পরিবর্তন এই দুটি দলের পৃষ্ঠপোষক গোষ্ঠীর না পসন্দ। তাই প্রতিটি নির্বাচনের আগে মানুষকে ঠকানোর জন্য একই প্রতিশ্রুতিকে ভাষার কারসাজিতে ভিন্ন চেহারায় হাজির করার কৌশল তো থাকলই, তার সাথে নতুন করে যুক্ত হল 'স্থায়ী সরকারের' প্রসঙ্গ। অর্থাৎ সরকার কেমন কাজ করল, না করল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল সরকারটা পাঁচ বছর টিকবে কি না। যুক্তি হল সরকারটা পাঁচ বছর না টিকলে ঘন ঘন নির্বাচন করতে হবে। আর ঘন ঘন নির্বাচন হলে দেশের কোষাগার থেকে বিপুল অর্থ খরচ হবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য। যে টাকা জনস্বার্থে ব্যবহার করা যেত, তা শুধু শুধু নির্বাচনের পেছনে খরচ করে লাভ কি? যারা এই যুক্তি দিয়ে মানুষকে প্রভাবিত করতে চাইছে, তারাই হাজার হাজার কোটি টাকা অবৈধ উপায়ে, বেআইনী পথে বিদেশে চালান করছে বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখার জন্য।

বর্তমান মোদি সরকারও ক্ষমতায় এসেছে নতুন প্রলেপের পুরানো প্রতিশ্রুতি আর স্থায়ী সরকারের দ্বি-চক্র বাহনে চেপেই। এর পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতেও ঘটবে, যদি না এই গোলকধাঁধা থেকে মানুষকে বের করে আনা যায়। কিন্তু বের করে আনার কোনো শর্টকাট রাস্তা নেই। আজ বললেই কাল একটা বিকল্প খাড়া করা যাবে না। প্রত্যেকটি ইস্যুকে ধরে একের পর এক আন্দোলনের ঢেউ তুলতে হবে (কংগ্রেস বা বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে ইস্যুর অভাব হবে না)। কেন্দ্রীয় ভাবে, রাজ্য ও অঞ্চল ভিত্তিক। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক-জনস্বার্থবাহী কোনো ইস্যুকেই ছাড়া যাবে না। শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী, ছাত্র-যুব-মহিলা, ধর্মীয়-ভাষাগত সংখ্যালঘু প্রভৃতি জনসমষ্টির সমস্ত অংশের পাশে প্রয়োজনে এবং সময়মতো উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। তাঁদের সমস্যা ও দাবি-দাওয়ার নিরিখে কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। প্রথমেই ঢেউ-এর আকার সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো বিশালাকৃতি নাও হতে পারে। কিন্তু যতদিন যাবে, যত বেশি মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা যাবে, তত বেশি জনসমাগম ঘটবে। প্রকৃত অর্থেই তা হবে ফর দি পিওপিল, অফ দি পিওপিল, বাই দি পিওপিল। এর মধ্য দিয়ে যে বিকল্পের অবয়ব তৈরি হবে, তা হবে অনেক নিখুঁত ও কার্যকরী। অর্থাৎ মানুষের ভরসাকে সম্বল করে বিকল্প তৈরি করা, বিকল্প তৈরি করে ভরসা অর্জনের চেষ্টা নয়। আর এই সময় সাপেক্ষ কাজ তখনই সম্ভব যদি এই সামগ্রিক উদ্যোগের কেন্দ্রে থাকে বামপন্থীরা। □

২৭ জুন, ২০১৪

পরিবর্তন-এর প্রকৃত থিম সং

বিশ্বকাপ ফুটবলকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা ও উন্মাদনার পারদ ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী। মাত্র ৩২টি দেশ এই প্রতিযোগিতার মূলপর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পাইলেও, বিশ্বকাপ ফুটবল লইয়া আলোড়ন যে শুধুমাত্র ঐ কয়েকটি দেশের অভ্যন্তরেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে তাহা নহে। যে দেশগুলি মূল পর্বে যাইবার সুযোগ পায় নাই এবং যাহাদের যাইবার কোনো প্রশ্নই ছিল না (যেমন আমাদের দেশ), সেই দেশগুলিতেও বিশ্বকাপ ফুটবল লইয়া উন্মাদনা বিন্দুমাত্র কম নহে। আবার উন্মাদনার মাপকাঠিতে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বাংলার স্থানটি যে অগ্রগণ্য এই বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। বাংলা ও বাঙালীর সহিত 'ফুটবল'-এর আত্মিক সম্পর্ক উপনিবেশিক কাল হইতেই বহমান। বৈদেশিক শাসন বিরোধী জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ছিল ফুটবল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শীল্ড ফাইনালে গোরাদের দল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের জয় আজও বাঙালীর স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বহুবিধ অস্থিরতাতেও বাংলার ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহামেডান স্পোর্টিং প্রেমে ভাঁটা পড়ে নাই। পরবর্তী পর্বে দূরদর্শনের কল্যাণে আন্তর্জাতিক ফুটবল চাক্ষুষ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে বাঙালীর ফুটবল প্রেমের পরিধি প্রসারিত হইয়া ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যায়।

২০১৪-র বিশ্বকাপ ফুটবল লইয়াও পাড়ায় পাড়ায় ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার উড্ডীন জাতীয় পতাকা প্রমাণ করে বাংলার ফুটবল প্রেম বর্তমানেও বহমান। তথাপি ইহা যেমন সত্য, তেমনই সত্য হইল ফুটবলের একাধিপত্যে অনেকটাই থাবা বসাইয়াছে ক্রিকেট। বস্তুত ক্রিকেট এখন জনপ্রিয়তার নিরিখে ফুটবলের প্রবল প্রতিপক্ষ রূপে হাজির হইয়াছে। বিশেষত ক্রিকেটের সীমিত ওভারের সংস্করণগুলির জনপ্রিয়তা ফুটবলকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিলেও সম্ভবত অত্যুক্তি হইবে না। ক্রিকেটের এহেন একটি জনপ্রিয়তম এবং নবীনতম সংস্করণ হইল আই পি এল প্রতিযোগিতা। ইহা কত দূর ক্রিকেটীয় এবং কত দূর বিনোদনমূলক তাহা লইয়া বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে। তথাপি সেই বিতর্কে প্রবেশ না করিয়াও, নিঃশংসয়ে যাহা বলা যাইতে পারে, তাহা হইল বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি, গড়াপেটা ইত্যাদি আই পি এল-র অঙ্গের ভূষণ হইলেও ক্রীড়ামোদীগণের হৃদয়ে ইহার অমোঘ আকর্ষণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে।

আই পি এল প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট হইল, এখানে কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানাধীন দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। তথাপি ব্যক্তি মালিকানাধীন দল বা ক্লাব বলিতে আমরা এযাবৎকাল যাহা বুঝিতাম, তাহার সহিত এগুলির বিস্তর প্রভেদ রহিয়াছে। সনাতনী ব্যক্তি মালিকানাধীন দলগুলি যেমন খেলোয়াড় নির্বাচন করে, তেমনি প্রতিটি খেলোয়াড়েরও পারিশ্রমিক ইত্যাদি প্রশ্নে নিজস্ব মতামত থাকে। এই দুই মিলিলেই একজন খেলোয়াড় কোনো একটি দল বা ক্লাবের পক্ষে খেলিবার জন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। আই পি এল-এ কোনো খেলোয়াড়েরই এমন কোনো স্বাধীনতা নাই। তিনি শুধুমাত্র নিজস্ব নাম নিলামবাজারে নথিভুক্ত করেন। পরবর্তী পর্বে কোন্ দল তাঁহাকে নিলাম বাজার হইতে ক্রয় করিবে, কত মূল্য ধার্য হইবে ইত্যাদি কোনো বিষয়ই তাঁহার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এহেন পদ্ধতিতে খেলোয়াড় ক্রয় করিবার জন্য বিভিন্ন দলের মালিক যাহারা নিলাম বাজারে উপস্থিত হন, তাঁহারা সকলেই শিল্পপতি অথবা রূপালি পর্দার নায়ক-নায়িকাগণ। বহুবিধ উৎস হইতে তাঁহাদের যে বিপুল আয়, তার অংশবিশেষ তাঁহারা নিলাম বাজারে বিনিয়োগ করেন খেলোয়াড় ক্রয় করিবার জন্য। ইহাও বাণিজ্যের একটি নতুন ফর্ম এবং বাণিজ্যের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মুনাফার লক্ষ্যেই অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং শিল্পপতিগণ বিনিয়োগ করেন। ক্রীড়াপ্রেমের তাড়নায় তাঁহারা ময়দানে উপস্থিত হন এমন ভাবনা সম্পূর্ণতই অমূলক।

যে কোনো বাণিজ্য তখনই লাভজনক হয় যদি উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি সম্ভব হয়। স্বভাবতই আই পি এল নামক ক্রিকেটীয় বাণিজ্যটিকে লাভজনক করিবার জন্য যে বহুবিধ পন্থা অবলম্বন করা হয়, তাহার অন্যতম হইল কোনো না কোনো রাজ্য অথবা শহরের নামে এক একটি দলের নামাকরণ। যেমন কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপারকিংস প্রভৃতি। বাস্তবে ঐ দলগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট শহর বা রাজ্যের দূরবর্তী কোনো সম্পর্ক না থাকিলেও, নামাকরণের মাহাত্মে ঐ শহর বা রাজ্যের ক্রিকেট প্রেমী মানুষের আবেগের উপর রেডিমেড দখলদারি সম্ভব হয়। উপরন্তু কৃত্রিম উন্মাদনা সৃষ্টি করিবার জন্য সুপারকিংস, রয়্যালস্ ইত্যাদি ভারি ভারি শব্দ যুক্ত করিয়া ছায়া যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করিবারও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এহেন অক্রিকেটীয় উপাদানে ভরপুর ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বর্তমান বৎসরটিতে বিজয়ী হইয়াছে 'কলকাতা নাইট রাইডার্স'। যে কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয় প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবি রাখে। নাইট রাইডার্সও এই কীর্তি অর্জন করিয়াছে। যাঁহারা ঘাম ঝড়াইয়া এই মাইল ফলকটি ছুঁইলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিনন্দন প্রাপ্য। নাইট রাইডার্স দলটিতে কলিকাতা তথা বাংলার কোনো খেলোয়াড় না থাকিলেও, শুধুমাত্র নামের মাহাত্মে কলিকাতা তথা বঙ্গবাসীর আবেগ ও উন্মাদনার বিপুল প্রকাশও বোধগম্য। কিন্তু যাহা বোধগম্য হইল না, তাহা হইল, এহেন একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন দলকে সরকারী কোষাগার হইতে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া রাজ্য সরকার কর্তৃক সম্বর্ধনা প্রদান। এমনকি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এতখানি গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন যে সরকারী কর্মসূচী মধ্যপথে স্থগিত রাখিয়া সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কীর্তিমানগণকে সম্বর্ধনা কোনো আপত্তির বিষয় নহে। কিন্তু যা অস্বাভাবিক, তাহা হইল শহর বা রাজ্যের সহিত সম্পর্ক রহিত একটি বেসরকারী দলকে সম্বর্ধনা প্রদানের জন্য সরকারী অর্থের অপচয়। বিশেষত সরকার যখন প্রায়শই বলিয়া থাকে আর্থিক অনটনের কারণেই নাকি রাজ্য কর্মচারীদের দাবি পূরণ সম্ভব হইতেছে না। বিপরীতে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলটির যিনি মালিক, প্রখ্যাত সেই অভিনেতা কি বাংলার ক্রীড়া ও তার পরিকাঠামো উন্নয়নে কোনো প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিলেন? না। তিনি বিজয়ী পুরস্কারের অর্থমূল্যটি সম্পূর্ণ পকেটস্থ করিয়া, ইডেন গার্ডেনসে দলবদ্ধভাবে খানিক নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করিয়া টা-টা, বাই-বাই করিলেন। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই রাজ্য। কৃষক ফসলের ন্যায্য মূল্য পাইবে না, শ্রমিকের মুখের উপর কারখানার গেট বন্ধ হইবে, বেকার কাজ পাইবে না, মহিলার সম্মান রক্ষিত হইবে না, কর্মচারী ডি-এ, বেতন কমিশন পাইবে না, কিন্তু সকলেই যাহা পাইবে তাহা হইল বলিউড-টলিউড নর্তন-কীর্তনে মজিয়া থাকিবার অজস্র উপাদান! ইহাই সম্ভবত পরিবর্তনের প্রকৃত থিম সং। □

১২ আষাঢ়, ১৪২১

দুখু মিঞা

কুমকুম মিত্র

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠর তীব্র দাবদাহের মধ্যেও এই মাসে বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে দিয়ে আমাদের মন হয়ে যায় স্নিগ্ধ। এই সময়ে যেমন আমরা পালন করি শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ-সংগ্রামের প্রতীক দিবস 'মে-ডে', তেমনই এই সময়ে আমরা পালন করি আমাদের খুব কাছের দুইজন প্রিয় মানুষের জন্মদিবস। আমাদের বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই বাংলা গদ্য ও পদ্য আধুনিক হয়েছিল এবং বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের হাতে বাংলা কবিতা ও গান প্রতিবাদের ভাষা ফিরে পেয়েছিল।

কাজি বংশের আদিপুরুষ হলেন সুদূর বাগদাদ থেকে আগত সুফি সাধক মহম্মদ ইসলাম। তিনি আদালতে বিচার করতেন বলে জনমানসে 'কাজি' রূপেই তাঁর প্রভাব ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৮৯৯ সালের ২৫ মে বর্ধমান জেলার আসানসোলের কাছে চুরুলিয়া গ্রামে এক প্রভাবশালী মুসলিম কাজি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নজরুল ইসলাম। তাঁর পিতা ছিলেন কাজি ফকির আহমেদ একজন ইমাম এবং তিনি স্থানীয় একটি মসজিদের দেখাশোনার কাজ করতেন। মাতা ছিলেন জাহিদা খাতুন। প্রচণ্ড আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়।

কবি বিভিন্ন স্থানে, বিচিত্রভাবে শিক্ষালাভ করেন। প্রাথমিকভাবে তিনি একটি গ্রামীন মোক্তবে পড়াশোনা শুরু করেন। স্থানীয় মসজিদে ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি তিনি বাংলা, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, সাহিত্য ইত্যাদি পাঠ করেন। ১৯০৮ সালে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ে। প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করে, হাইস্কুলে পড়ার সুযোগ থাকা সত্বেও দু-মুঠো সাদা ভাতের জন্য তিনি তখন বাধ্য হয়ে একটি পাঠশালায় ছোট পণ্ডিতের চাকরি শুরু করেন। শুরু হয় কর্মজীবন। বাঁচার লড়াই। পরে পরিবারের অভাব-অনটন দেখে তিনি গ্রহণ করেন গ্রামের মসজিদের 'ইমাম' ও 'মোয়াজ্জীন'-এর পদ। এ ব্যাপারে তিনি মূলত তাঁর খুড়তুতো কাকা মুন্সি বজলে করিমের কাছে উৎসাহ ও সাহস পেয়েছিলন। করিম সাহেব বাংলা গান ও উর্দু গজল লিখে নিজেই সুর দিয়ে গাইতেন। করিম সাহেবের এই গায়কসত্তাও নজরুলের কিশোর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এত অল্প বয়সে নজরুল কাজ করেও পরিবারের সকলের আহার জোটাতে পারেন নি। দারিদ্রের তাড়নায় দিশাহারা হয়ে, এই অসহায়তা থেকে মুক্তি পেতে সবকিছু ছেড়ে তিনি স্থানীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় একটি লেটোর দলে যুক্ত হয়ে গান বেঁধে, চাপান-উতোরে অংশ নিয়ে তিনি তাঁর গায়ক ও গীতিকার সত্তাকে ক্রমশ চিনতে পারলেন ও প্রকাশ করলেন। এইসময় তিনি লেটোর গান ছাড়াও চাপান গান, ঠেস গান, সঙের গান, ডাকসুরার গান, ছড়া ও বন্দনার গান এবং উর্দু-ফারসী-ইংরাজী শব্দ ও বাক্য মিশ্রিত গানও লেখেন। লেটোর দলে যুক্ত হয়ে নজরুল যেমন পেয়েছিলেন মুক্ত জীবনের আনন্দ, তেমনি নানাভাবে নিজেকে সৃষ্টিশীল চর্চায় যুক্ত রাখার ফলে তাঁর মেধা ও প্রতিভার আলো ধীরে ধীরে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

একদিন পেটের দায়ে অকালে পড়াশোনা ছেড়ে তিনি বিভিন্ন চাকরি করেন। পরে মনের টানে লেটোর দলে যোগ দিয়ে মানসিক তৃপ্তি পেলেও খালি পেটের চোঁয়া ঢেকুর বড্ড বেপরোয়া। তাই তিনি গ্রাম ছেড়ে আসানসোলের একটি রুটি কারখানায় মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের বয়গিরির চাকরি করেন। এখানে কাজ করার সময় আসানসোলের দারোগা কাজি রফিজউদ্দীনের সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং রফিজউদ্দীনের উদ্যোগেই ১৯১২ সালে কবি আবার পড়াশোনা শুরু করেন। ভর্তি হন ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে। এই স্কুলের সহপাঠীদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ভালোভাবে পাশ করেও পালিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ থেকেই যায়। তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় কাজি মঞ্জুর হোসেনের উদ্যোগে পরে তিনি সম্পূর্ণ বিনা বেতনে ও বোর্ডিং-এ থাকার সুবিধাসহ ভর্তি হন শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম হন। কিন্তু বোর্ডিং-এ খাওয়াদাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মন কষাকষি হলে তিনি সেই স্কুল ছেড়ে আত্মীয়স্বজনদের উদ্যোগে মাথরুন হাই-ইংরাজী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন পল্লী কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কিন্তু দারিদ্রতার কারণে ঠিকমতো স্কুলের ফিজ দিতে না পারায় তাঁকে এই স্কুলও ছাড়তে হয়। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেরিয়ে শুধু শিক্ষালাভ করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র পরিবেশ ও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শ, তাঁর সংবেদনশীল মনকে করে তুলেছিল উদার, কৌতূহলী, অসহায়ের প্রতি নিখাদ ভালোবাসার প্রকাশে নির্ভীক, স্নেহ-মায়া-মমতায় ভরপুর।

পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি ব্রিটিশ আর্মিতে হাবিলদারের কাজে যোগ দেন। এই চাকরি নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধের রণকৌশল শিখে দেশ স্বাধীন করার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া। দুঃসাহসিক জীবনযাপনের তেজ যেমন নজরুলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে কোনো প্রকার বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, তেমনই সেই আবেগই তাঁর মেধাবী শিক্ষাজীবনে দাঁড়ি টেনে দিয়েছিল। তিনি করাচির ক্যান্টনমেন্টে ৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেন্টে পোস্টিং পান। সেই সময়েই তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর দ্বারা প্রভাবিত হন এবং গদ্য ও পদ্য লেখা শুরু করেন। আর্মিতে কাজ করার সময় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সাধারণ মানুষের উপর ভারতীয় ব্রিটিশরাজের আক্রমণ। এই আক্রমণ তিনি তাঁর কবিতা ও গানের মধ্যে দিয়ে প্রচার করেন। যেমন—'বিদ্রোহী', 'ভাঙার গান' ইত্যাদি। তাঁর লেখার মূল বিষয় ছিল ভালোবাসা, স্বাধীনতা ও বিপ্লব। তিনি সবরকম ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তাঁর কলম চালিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন কবি, সঙ্গীতকার, সুরকার, সঙ্গীতশিল্পী ও বিপ্লবী। তিনি ফ্যাসিবাদ ও নিপীড়ন-শোষণের বিরুদ্ধে বারবার তাঁর কলম ব্যবহার করেছিলেন।

১৯২০ সালে তিনি আর্মির চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে ৩২নং কলেজস্ট্রীটের দোতলার একটি ছোট ঘরে বসবাস শুরু করেন, সেই ঘরেই থাকতেন মুজফ্ফর আহমেদ, দুজনে ছিলেন রুমমেট। তখন তিনি কবিতা লেখার চেয়েও গানের সুর ভাঁজেন বেশি। হারমোনিয়ামে সুর তোলার সাথে সাথে গানের কথাও বলেন—"আমরা শক্তি, আমরা বল, আমরা ছাত্রদল..."। এছাড়াও তিনি এইসময় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'তে যোগ দেন এবং তখন থেকে উপন্যাস লেখাও শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বাঁধনহারা'। গান-কবিতা-উপন্যাসের বাইরেও এইসময় কলকাতায় তিনি নিজেকে একজন সাংবাদিক হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট।

১৯২১ সালে তিনি অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লায় চলে আসেন। সেখানে ব্রাহ্ম সমাজের এক মহিলা প্রমিলাদেবীর সাথে তাঁর পরিচয়, প্রণয় ও বিবাহ হয়। এইজন্য তাঁকে সমাজেও প্রচুর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁদের প্রথম সন্তান Prematurity-র জন্য মারা যায়। দ্বিতীয় সন্তান হয় বুলবুল, যে ছিল তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়। এরই মধ্যে তিনি দেশের নিপীড়িত শোষিত মানুষদের উপর ব্রিটিশরাজের অত্যাচার দেখতে দেখতে দেশের মানুষের মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন, এর ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার হয়ে হাজতবাসও করতে হয়। জেলের মধ্যে বসেও তিনি ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে বহু গান-কবিতা লিখে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯২৩ সালে তাঁকে আলিপুর জেল থেকে সরিয়ে হুগলিতে নিয়ে যায়। জেলের অভ্যন্তরে বন্দীদের প্রতি জেল সুপারেনটেনডেন্টের যে অমানুষিক অত্যাচার, দুর্ব্যবহার তার প্রতিবাদে ও বন্দীদের রাজনৈতিক মর্যাদা না দেওয়ার প্রতিবাদে তিনি চল্লিশ দিন অনশন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কবিগুরুও উপলব্ধি করেন যে, এইরকম প্রতিভাধর মানুষকে অকালে হারালে দেশের ক্ষতি, তাই তিনি তাঁকে টেলিগ্রাম করেন—"Give up hunger strike our literature claims you." ফলশ্রুতিতে কাজি নজরুল ইসলাম অনশন ভাঙেন এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনি মুক্তিও পান।

১৯২৬ সালে তিনি তাঁর স্ত্রী ও পুত্র বুলবুলকে নিয়ে কৃষ্ণনগরে চলে আসেন। এখানে তিনি শোষিত নিপীড়িতদের নিয়ে 'দারিদ্র' কবিতাটি লেখেন। কচি-কাঁচাদের মধ্যে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর লেখা কবিতা—ঝিঙে ফুল, খুকী ও কাঠবেড়ালী, খাঁদু-দাদু, প্রভাতী, লিচু চোর ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। রাজনৈতিকভাবে তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

স্যার আইজ্যাক নিউটন কিছু অপ্রকাশিত বিষয়

স্যার আইজ্যাক নিউটন। আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। তিনিই প্রথম গতিবিদ্যাকে সূত্রায়িত করেছিলেন। মহাকর্ষ বলের আবিষ্কারও তাঁরই কীর্তি। তাঁর তৈরি করা তত্ত্বগত কাঠামোর সাহায্যে গ্যালিলিও গ্যালিলি ও জোহান কেপলারের সৌরজগৎ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকে অনুধাবন করা যায়। সূর্যের আলো, কাঁচের প্রিজম ও দর্পণের সাহায্যে তাঁর পরীক্ষা বিভিন্ন রঙের উৎস সম্পর্কে ধারনা তৈরি করেছিল এবং এক নতুন ধরনের টেলিস্কোপ নির্মাণে সাহায্য করেছিল। গণিতে ক্যালকুলাসও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এককভাবে এবং ক্যালকুলাসের অপর স্রষ্টা গটফ্রিড লিবনিজ-এর সাথে এ নিয়ে (অর্থাৎ ক্যালকুলাস আবিষ্কারের প্রথম কৃতিত্ব কার?) তাঁর বেশ দ্বন্দ্ব ছিল। তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন পদার্থ বিদ্যার সমস্ত সূত্রই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই অপরিবর্তিত থাকবে।

তিনি যখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখনই তাঁর অসাধারণত্ব সকলের নজরে আসে। মাত্র ২৬ বছর বয়সেই তাঁকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের 'লুকাসিয়ান প্রফেসর' সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৭২৭ খৃস্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে যখন তিনি মারা যান, তখন তিনি জাতীয় নায়ক, রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি এবং রয়্যাল মিন্ট্-এর 'ওয়ার্ডেন' ও 'মাস্টার'। ওয়েস্ট মিন্স্টার অ্যাবে-তে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

তাঁর মতো বিপুল খ্যাতি সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্বের পক্ষে যা মানানসই, ঠিক তেমনভাবেই তাঁর মৃত্যুর পর পাওয়া গেছে শতাধিক নোটবই ও সাদা কাগজে তাঁর অসংখ্য গবেষণাধর্মী লেখা। যেগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল তাঁর সর্বোত্তম কীর্তি 'ফিলোজ ফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপ্রিয়া ম্যাথিমেটিকা' এবং আলোক রশ্মির ওপর তাঁর গবেষণা 'অপটিক্স্'। এছাড়াও ছিল সমসাময়িক বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সাথে তাঁর মতামত আদান-প্রদান সংক্রান্ত নথি, পাতার পর পাতা জুড়ে গণিত ও পদার্থ বিদ্যার বিভিন্ন সূত্রের ব্যাখ্যা এবং পদার্থের রূপান্তর সংক্রান্ত মধ্যযুগীয় রসায়নশাস্ত্র বা অপরসায়ন এবং ধর্ম বিষয়ক অসংখ্য লেখা।

নিঃসঙ্গ এবং অস্থিরমতি চরিত্রের নিউটন তাঁর সমস্ত লেখা ও গবেষণাকে সংরক্ষণ করেছিলেন। এমনকি কেমব্রিজে ছাত্রাবস্থায় হিজিবিজি করে লেখা 'কালি' প্রযুক্তির পদ্ধতি সংক্রান্ত লেখা কাগজটিও রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত লেখা ও গবেষণাকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি মৌন থাকতেন। সম্ভবত বিতর্ক ও সমালোচনা এড়িয়ে চলতে পছন্দ করতেন বলেই। ক্যালকুলাসের আবিষ্কার বিষয়ে লিবনিজের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব সম্ভবত তাঁকে এ বিষয়ে অনেক বেশি স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর অর্ধেকের বেশি লেখা ছিল অপ্রকাশিত। বিশেষত ধর্ম ও অপরসায়ন সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় চিন্তাই ছাপার অক্ষরে দিনের আলো দেখে নি।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তাঁর মৃত্যুর পর অপ্রকাশিত লেখাগুলি কোথায় গেল? নিউটন নিজে ছিলেন অবিবাহিত। এবং মৃত্যুর সময় কোনো 'উইল করে যান নি। উত্তরাধিকার সূত্রে এই সমস্ত লেখা গিয়ে পৌঁছয় জন কনডুইট নামে এক ব্যক্তির হাতে। যিনি নিউটনের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ক্যাথরিন বার্টনকে বিবাহ করেছিলেন। কনডুইট নিউটনের জীবনী প্রকাশ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন কিন্তু সফল হন নি। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের আদর্শ রূপে নিউটনের যে ভাবমূর্তি কনডুইট নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকে সযত্নে রক্ষা করতেন। কনডুইট সম্ভবত নিউটনের ধর্ম বিষয়ক লেখাগুলির বিস্ফোরক উপাদান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। নিউটন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ঈশ্বরের তিন রূপ—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা সম্পর্কিত খ্রীষ্টীয় ধারণার বিরোধী ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর এই ধারনা এবং চার্চ-এর 'পবিত্র উপদেশ' না মেনে চলার অভ্যাস তাঁর সমসাময়িক কেমব্রিজ ফ্যাকাল্টির অন্যান্য সদস্যদের রুষ্ট করতে পারত, এই ধারনা থেকেই সম্ভবত তাঁর ধর্ম সম্পর্কিত লেখাগুলি কখনও প্রকাশ করেন নি।

কনডুইট ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর, নিউটনের সমস্ত অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র ইংল্যান্ডের পোর্টস্মাউথে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের হাতে পৌঁছোয়, এবং সেখানেই পরবর্তী ১৫০ বছরের অধিকাংশ সময় সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তী সময়ে খসড়া গবেষণা পত্রগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায়, কিছু বিক্রীও হয়ে যায়।

অবশেষে প্রখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইনস্ এই সমস্ত গবেষণা পত্রের একাংশ উদ্ধার করেন। তিনি মূলত নিউটনের মধ্যযুগীয় রসায়ন চর্চা (অপরসায়ন) সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইহুদি বুদ্ধিজীবী আব্রাহাম ইয়াহুদা, যিনি নিউটনের ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় আগ্রহী ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে কেমব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আরও কয়েকজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যেমন জর্জ গ্যাব্রিয়েল স্টোক (যিনি নিউটনের মতোই লুকাসিয়ান প্রফেসর ছিলেন) এবং জন কউচ অ্যাডামস্ (যিনি নিউটনকৃত যন্ত্রকে ব্যবহার করেছিলেন নেপচুনের অস্তিত্ব নির্ধারণের জন্য) উদ্যোগী হয়েছিলেন, যদি নিউটনের গবেষণাপত্র থেকে তাঁর সুবিপুল জ্ঞানের কোনো নতুন দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু নিউটনের জ্ঞানের মহাফেজখানার বিশালত্ব ও জটিলতার জন্য তাঁরা খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেন নি।

নিউটনের অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র থেকে তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা সৃষ্টি হয় তা তাঁর প্রকাশ্য যুক্তিবাদী ভাবমূর্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম কারিগর নিজে খুব আধুনিক ছিলেন না। মধ্যযুগীয় রসায়নশাস্ত্র (মূলত ধাতুকে স্বর্ণে রূপান্তরের বিদ্যা) বা অপরসায়ন ছিল তাঁর পছন্দের বিষয়। তিনি অপরসায়নের বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুতির পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তার গবেষণাগারে সেগুলিকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতেন।

নিউটন সম্পর্কে কেইন্সের মূল্যায়ন হল, বিজ্ঞানের এই বিশাল প্রতিভার চেতনার জগৎ তাঁর সময়ের থেকে এগিয়ে ছিল না। তাই তিনি যুক্তি বিদ্যার প্রথম সম্রাট ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঐ পর্বের শেষ যাদু সম্রাট। □

সুমিত ভট্টাচার্য

মালদহ হাসপাতালে শিশুমৃত্যু

সম্প্রতি মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অজানা রোগে ১৫টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত এবং হাসপাতালে ভর্তি শিশুর সংখ্যা সাইত্রিশ জন, এ খবর স্বাস্থ্য দপ্তরের। স্বাস্থ্যকর্তারা মানছেন হাসপাতালের বাইরেও একই উপসর্গে কয়েকজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বিশেষজ্ঞরা এখনও রোগটির কারণ চিহ্নিত না করতে পারায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে। মৃত এই শিশুদের বয়স দুই থেকে চার বছর। প্রবল জ্বর, মাথা যন্ত্রণা, বমি ও খিঁচুনির মতো উপসর্গ নিয়ে শিশুদেরকে তাদের বাড়ির লোকজন হাসপাতলে নিয়ে আসেন। ৭ জুন ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ৮টি শিশুর মৃত্যু ঘটায় বিষয়টি প্রথম জনসমক্ষে আসে। মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সহ অধ্যক্ষ ডাঃ এম এ রশিদ দাবি করেন রসালো লিচু থেকেই এ রোগ ছড়াচ্ছে। তিনি আরও বলেন 'এবারই প্রথম নয়, ২০১২-তেও এই হাসপাতালেই শতাধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল এই উপসর্গে'।

তবে গ্রীষ্মের এই সুস্বাদু ফল নিয়ে এখনই যে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই তা জানিয়ে রাখছেন বিশেষজ্ঞরা। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরোলজি বিভাগের প্রধান নিমাই ভট্টাচার্য্য যেমন বলছেন 'লিচু খেয়েই শিশুগুলি মারা গিয়েছে, একথা নিশ্চিতভাবে বলার সময় আসেনি। এ নিয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।'

ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আয়ুর্বেদ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের অধ্যাপক প্রদ্যোৎ বিকাশ করমহাপাত্র বলেন 'লিচু মরসুমি ফল। যে কোনো মরসুমি ফলই সেই ঋতুর সম্ভাব্য রোগভোগের বিরুদ্ধে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। লিচু মিষ্টি, অর্থাৎ সবসময়েই তা বলদায়ক এবং পুষ্টিকর। ফলে লিচু খেয়ে বড় রোগভোগের আশঙ্কা নেই। তবে সার, কীটনাশক বা সংরক্ষণে ব্যবহৃত রাসায়নিক থেকে বিষক্রিয়া হলে আলাদা ব্যাপার।'

মালদহ মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরাও দ্বিধাবিভক্ত শিশুমৃত্যুর কারণ নিয়ে। লিচু থেকে ভাইরাল সংক্রমণের কথা যেমন অনেকে বলেছেন, তেমনই আবার লিচু সংরক্ষণে ব্যবহৃত রাসায়নিককেও কাঠগড়ায় তুলছেন চিকিৎসকদের একাংশ। ঐ হাসপাতালের এক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের কথায় 'এই শিশুদের সকলেই লিচু খেয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। গত বছরও এভাবে অনেক শিশু মারা গিয়েছিল। তাদের অনেকের মস্তিষ্ক সুষুম্নারসের (সেরিব্রো-স্পাইনাল ফ্লুইড) নমুনা ট্রপিক্যালে পাঠানো হয়েছিল পরীক্ষার জন্য। সেই নমুনায় কিন্তু ভাইরাসের চিহ্ন মেলেনি। তাই আমাদের সন্দেহ, লিচু সংরক্ষণে ব্যবহৃত রাসায়নিকের জেরে কেমিক্যাল এনকেফালোপ্যাথিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে শিশুগুলির।'

রাজ্যের স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন প্রয়োজনে ঐ শিশুদের মস্তিষ্ক-সুষুম্নারসের নমুনা পুণের ইনস্টিটিউট অফ ভাইরোলজিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। এদিকে মালদহের হাসপাতালে শিশুমৃত্যুর ভয়াবহতা নিয়ে প্রায় ৯৬ ঘণ্টা পর প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে শিশুমৃত্যুর খতিয়ান দেওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার ফল খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কবার্তাও ঘোষণা করলেন। যার মোদ্দা কথা, শুধু লিচু নয়, যে কোনো ফল, যা কৃত্রিমভাবে পাকানো হয়, তা না খাওয়াই ভালো, আক্রান্ত শিশুদের রক্তের শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে শুশ্রূষা করে তাদের প্রাণ ফেরানোর ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য পাওয়ার পরবর্তীতে এই সাংবাদিক সম্মেলনে মালদহ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, এ পর্যন্ত এই হাসপাতালে ১৩ জন শিশু মারা গেছে রবিবার (৮ জুন) রাত ১২টা পর্যন্ত ১২ জন এবং এর পরেও আরও একজন মারা গেছে। ২৭ জন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাজ্যের উপস্বাস্থ্য অধিকর্তা দীপঙ্কর মাজি জানান, আরও তিনজন শিশু মারা গেছে। এরা এই একই রোগে মারা যেতে পারে। তবে তার কারণ এখনও পরিষ্কার নয়। তিনি জানান, রবিবার ৮ জন শিশুর রক্ত, লালা, মলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এছাড়া সোমবার চার জন শিশুর শিরদাঁড়া থেকে রক্তরস সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। কলকাতা থেকে পরীক্ষার রিপোর্ট মঙ্গলবার পাওয়া যেতে পারে। তবে পুনের ন্যাশনাল ইন্সস্টিটিউট অব ভাইরোলজি থেকে রিপোর্ট না পেলে বিষয়টি চূড়ান্তভাবে পরিষ্কার হবে না। তিনি বলেন মূলত কালিয়াচক-১ ব্লক থেকে রোগী আসছে। কালিয়াচক-২ এবং ৩ নম্বর ব্লক থেকেও এই রোগের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

মালদহ সদরের মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসন ঐ পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে সচেতনতা বাড়াতে বৈঠক করেছে। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হচ্ছে একথা বলা যাচ্ছে না। কারণ গ্রামবাসীরা বলছেন, কারও কাছেই অসুখ সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য নেই।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ২০১২-তেই যখন এই সংক্রমণে শতাধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছিল, তখনই এ নিয়ে সচেতনতা প্রচার শুরু হয়নি কেন? জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর দু'বছর মুখে কুলুপ দিয়ে বসেছিল কেন? এখনও 'লিচু সংরক্ষণে সাবধানতা অবলম্বন করুন' বলে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু কী ধরনের সাবধানতা, কীভাবে তা নেওয়া হবে, তা নিয়ে অন্ধকারে লিচু চাষিরা। হাসপাতালে যে শিশুদের চিকিৎসা চলছে সেখানেও উদাসীনতার ছাপ স্পষ্ট। শিশু বিভাগের মধ্যে পলিথিন দিয়ে একটা ঘেরাটোপ তৈরি করে সেখানে আক্রান্তদের রাখা হয়েছে। ফলে ভর্তি থাকা অন্যান্য শিশুদের বাবা-মায়েরা চরম আতঙ্কে ভুগছেন। এই মেডিক্যাল কলেজের স্বাস্থ্য কমিটির চেয়ারম্যান তথা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর বক্তব্য জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে। □

দেবাশীষ রায়

মাথাচাড়া দিচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা

কত উইকেট এভাবেই হারাতে হবে জানা নেই

গোধরা কাণ্ডের পরবর্তী সময়ে শোনা গিয়েছিল 'ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব'। পুনের বিজেপি সাংসদ অনিল শিরোলের মুখেও 'তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী' মহসিন সাদিক শেখের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একই সুর শোনা গেল। তার কথায় 'ফেসবুকে যা বেরিয়েছে তা খুবই বেদনাদায়ক—কিছুটা পালটা প্রতিক্রিয়াও তো স্বাভাবিক'। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নব নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর এখনও কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শিবাজী ও প্রয়াত শিবসেনা প্রধান বাল থ্যাকরেকে নিয়ে কোনো এক অজ্ঞাত ব্যাক্তি ফেসবুকে আপত্তিকর কিছু পোস্ট করেছিল। শোনা যাচ্ছে এই পোস্ট কোনো প্রক্সি সার্ভার থেকে তিনটি দেশে করা হয়েছে। রবিবার ১.৬.১৪ তারিখ থেকে সেই 'পোস্ট' ও তাকে ঘিরে নানা গুজব ছড়াতে থাকে—বলা হয় শিবাজীর মূর্তিতে পাথর ছোঁড়া হয়েছে—এক হিন্দু তরুণীকে মুসলিম যুবকরা ধর্ষণ করেছে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইসব গুজবকেই হাতিয়ার করে শিবসেনা সহ উগ্র হিন্দুত্ববাদী বেশ কিছু সংগঠন, বিশেষ করে 'হিন্দু রাষ্ট্র সেনা' মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভের নামে হাঙ্গামা শুরু করে। ভাঙচুর করা হয় তিনশোরও বেশি বাসে ও অন্যান্য গাড়ি সহ বেশ কিছু দোকানপাটে।

২ জুন রাতে নামাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় তেমনই একদল ধর্মান্ধ উন্মত্ত দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন পুনের হাদাপসারের বাসিন্দা, একটি টেক্সটাইল কোম্পানির তথ্য প্রযুক্তি শাখার কর্মী মহসিন সাদিক শেখ। হকি স্টিক, লাঠি, তরোয়াল ও পাথর দিয়ে সাদিকসহ তার বন্ধুদের উপর আক্রমণ করা হয়। পুলিশ পৌঁছানো মাত্র আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। পুলিশ আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি করলে, রাত একটা নাগাদ মহসিন সাদিক শেখের মৃত্যু হয়। এই বর্বর আক্রমণের ঘটনার নিন্দা শোনা যায়নি প্রধানমন্ত্রী বা তার মন্ত্রীদের মুখ থেকে। প্রতিক্রিয়া শোনা যায়নি শাসক বিজেপি দলের কোনো শীর্ষ নেতার মুখ থেকেও।

এই ঘটনার তাৎপর্য ভীষণ গভীর ও সুদূর প্রসারী। যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না, তাঁরা নিতান্তই নিরীহ। পুনে পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের বক্তব্য অনুযায়ী এই হামলায় ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের বয়স ১৮ থেকে ২২ এর মধ্যে এবং এরা সকলেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দু রাষ্ট্র সেনার কর্মী। এদের বিরুদ্ধে ১৪৭, ৩০২, ৩০৭ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের বক্তব্যে প্রকাশ খুব পরিকল্পিত ভাবেই এই হাঙ্গামা চালিয়েছে মৌলবাদীরা।

এই খুন সংগঠিত হওয়ার পরেই এস এম এস-এ ছড়িয়ে পড়েছে উল্লাস—'পহেলি উইকেট পড়লি' অর্থাৎ প্রথম উইকেট পড়ল। এই এস এম এস-এর সূত্র ধরেই পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে এই হামলার ঘটনার গভীরতা পূর্ব পরিকল্পিত। প্রসঙ্গত আগামী অক্টোবরে মহারাষ্ট্র বিধানসভার নির্বাচন। তাই উগ্র হিন্দুত্বের তাস খেলে মহারাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমেছে বিজেপি ও শিবসেনা। সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিজেপির উত্থান তাই নতুন আবহের ইঙ্গিত দিচ্ছে। □

সুগত দাস

বাজেটের আগেই রেলে ব্যাপক যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি

সুদিন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেই মোদি সরকার রেলের যাত্রীভাড়া ও পণ্য মাশুল ব্যাপক বৃদ্ধি করে জনগণকে দুর্দিনেরই অশনি সঙ্কেত দিলেন। রেলে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.২ শতাংশ ও পণ্য মাশুল বেড়েছে ৬.৫ শতাংশ। কিন্তু লোকাল ট্রেনের মাসিক টিকিটের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির হার ১০০ শতাংশ। অর্থাৎ আগে মাসিক টিকিটের ক্ষেত্রে ১৫টি সফরের ভাড়া দিতে হত, এখন গুনতে হবে ৩০টি সফরের ভাড়া। ২৫ জুন ২০১৪ থেকে এই নতুন ভাড়া কার্যকরী হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ।

অথচ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দু'বছর আগে রেলের পণ্য পরিবহণ মাশুল বৃদ্ধির প্রসঙ্গে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, যখন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের বাইরে চলে গেছে, তখন ভাড়া বৃদ্ধি অনুচিত কাজ। কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই তাঁর চেতনা সম্পূর্ণ বিপরীতগামী, এর নামই দ্বিচারিতা।

সামনেই বাজেট। সেখানে সংসদকে এড়িয়ে এভাবে আচমকা রেল ভাড়া বাড়ানো দেখে বোঝা যায় এই সরকার কতটা মরিয়া। এর বিরুদ্ধে বামপন্থীসহ অন্যান্য বিরোধীদের স্টেশনে স্টেশনে বিক্ষোভ সমাবেশ, ধর্ণা, অবস্থান ও মিছিলের কর্মসূচী চলছে দেশ জুড়ে। বামপন্থীরা বলেছেন এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত সারা দেশে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে, কারণ বিজেপির বিরুদ্ধে ৬৯ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। এই রেলভাড়া ও পণ্য মাশুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও হুহু করে বেড়ে যাবে যার বোঝা এসে পড়বে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে।

এই রেল ভাড়া বৃদ্ধির সমর্থনে ময়দানে নেমে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ফেসবুকের এক পোস্টে বলেন, রেল ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পূর্বের ইউপিএ সরকারই নিয়েছিল। কিন্তু সাহসের অভাবে তা প্রয়োগ করে যেতে পারেনি। বর্তমান রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া সেটা প্রয়োগ করে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে এক মত নয় সরকারের বর্তমান শরিক মহারাষ্ট্রের শিবসেনা ও দক্ষিণের ডি এম কে এবং এ ডি এম কে। বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে দক্ষিণীরা বলেছে, ভুল অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেশবাসীকে হয়রানির মধ্যে ফেলেছিল ইউপিএ। সে জন্যই যে দেশবাসী তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন একথা ক্ষমতায় এসে ভুলে গেলে চলবে কি করে। একই সুরে প্রতিবাদ জানিয়েছে উত্তরের সপা ও বসপা। কেরল, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশের নানা জায়গায় রেল রোকো আন্দোলন করে কংগ্রেস, এন সি পি ও সপা। মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস ও এন সি পি নেতারা জানিয়েছে বর্ধিত রেল ভাড়া প্রত্যাহার না হলে তাঁরা বিনা টিকিটে রেলে চড়ে প্রতিবাদ জানাবেন। রাজ্যে হাওড়া, শিয়ালদহ সহ বর্ধমান, শিলিগুড়ি, শেওড়াফুলি, বালুরঘাট সহ একাধিক স্টেশনে বামপন্থীদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করতে গেলে জি আর পি এবং আর পি এফ আক্রমণ চালায়, কিন্তু তাতেও না দমে তাঁরা সেখানে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেন। আন্দোলনের চাপে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির হার কিছুটা সংশোধিত হয়েছে। লোকাল ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভাড়া বাড়ছে না। মান্থলি টিকিটের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির সংশোধিত হার হল ১৪.২ শতাংশ। □

সুতপা হাজরা

জলপাইগুড়ি জেলায় সংগঠন দপ্তরে তৃণমূল কংগ্রেসের হামলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

গত ১৬ মে ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় মিছিল থেকে কিছু সমর্থক জলপাইগুড়ি জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের অভ্যন্তরে কামাক্ষ্যাগুড়ির কর্মচারী ভবনে সংগঠনের লাগানো তালা ভেঙে ফেলে অন্য তালা লাগিয়ে দেয়। স্থানীয় গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্ব কর্মী, আমাদের দু-এক জন সদস্য, যাদের বাড়ি কর্মচারী ভবনের কাছাকাছি এবং তৃণমূল দলের দু-একজন সমর্থক জেলার ব্লক সম্পাদক জেলা নেতৃত্বকে সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা জানান।

গত ২১.৫.২০১৪ তারিখে আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাসকের কাছে এই মর্মে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। মহকুমা শাসক আই সি কুমারগ্রাম থানাকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেবার পরেও কুমারগ্রাম থানা বিষয়টি নানাভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

আলিপুরদুয়ার মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে পরপর দুবার মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। কুমারগ্রাম থানা ইতিমধ্যেই কিছুটা নড়াচড়া শুরু করেছে। জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকেও বিষয়টি জেলা শাসককে জানানো হয়েছে।

মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে কুমারগ্রাম থানার সাথে যোগাযোগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার কাকদ্বীপে একই ধরনের হামলার ঘটনা ঘটেছিল। স্বভাবতই সাধারণ মানুষের সাথে সাথে কর্মচারীরাও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রকৃত চেহারা উপলব্ধি করতে পারছেন।□

সাম্বার দেশে মহারণ এবং...

মানস দাস

এই লেখা হাতে পাওয়ার আগেই আমরা ফুটবল প্রেমে মজে আছি। খেলার জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবলের বিশ্বকাপ শুরু হয়ে গেছে ১২ জুন। ১২টি স্টেডিয়ামে চলবে এই মেগা ইভেন্ট। ১৩ জুলাই রিও ডি জেনিরো'র ৭৮,৮৩৮ জন দর্শকাসন বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী মারকানা স্টেডিয়ামে ফাইনালের মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি ঘটবে ২০তম বিশ্বকাপ ফুটবলের। ১৯৩০ সাল থেকে শুরু হয়ে প্রতি চার বছর অন্তর বসছে এই মহারণ। মাঝে বাদ গেছে দুটি বছর ১৯৪২ ও ১৯৪৬। ঐ দুটি বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য এই মেগা ইভেন্ট করা যায় নি। পৃথিবীর সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা নিয়ে 'ফিফা' বলছে সারা পৃথিবীতে দুই শতাধিক দেশে ২৬৫ মিলিয়ন মানুষ ফুটবল খেলে। আর এবারের বিশ্বকাপ ফুটবল হচ্ছে ফুটবলের মক্কা ব্রাজিলে। শেষবার ব্রাজিলে বিশ্বকাপ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫০-এ। এবার কি অতৃপ্তি মিটবে নিজের দেশের শেষ বিশ্বকাপের অপ্রাপ্তির?

ফিরে দেখা পঞ্চাশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বারুদে আগুন কেড়ে নিয়েছিল দু-দুটি বিশ্বকাপ। ১৯৩৮-এর পর ১৯৫০ সালে বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছিল ব্রাজিলে। বিশ্বকাপে আগাগোড়া দুরন্ত খেলে ফাইনালে উঠে এসেছিল ব্রাজিল। অন্যদিকে উরুগুয়ে। ১৬ জুলাই ফাইনালে ঐতিহাসিক মারকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিল সমর্থকদের ভিড় উপচে পড়েছিল। সরকারী তথ্যে ১,৯৯,৪৫৪ জন দর্শক (বেসরকারী মতে ২,১০,০০০ জন) এ পর্যন্ত কোনো একটি ফুটবল খেলায় রেকর্ড সংখ্যক দর্শক সমাগম হয়েছিল ফাইনালে। প্রবল টেনশনে দর্শকদের প্রত্যাশার চাপ নিতে না পারায় ২-১ গোলে উরুগুয়ের কাছে পরাজিত হয় ব্রাজিল। স্তব্ধ হয়ে যায় স্টেডিয়াম।

১৯৫০-এর বিশ্বকাপের সাথে আমাদের দেশের নামও জড়িয়ে আছে। সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষ এশিয়া থেকে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এশিয়ার যোগ্যতা নির্ণয়কারী পর্বে বাকি তিন দেশ ফিলিপাইন্স, ইন্দোনেশিয়া ও বার্মা নাম তুলে নেওয়ায় ভারত সরাসরি ব্রাজিলে মূলপর্বে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। তার আগে ১৯৪৮ সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে লন্ডনে ভারতীয় ফুটবল দল সাড়া জাগানো ফল করে। শক্তিধর ফ্রান্সের সাথে ২-১ গোলে পরাজিত হলেও ৭০ মিনিট অবধি ১-১ গোলে আটকে ছিল ফ্রান্স। বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ভারত বিশ্বকাপে খেলতে

যায় না। খালি পায়ে ফুটবল খেলতো বলে যায়নি এমনটা প্রচারিত হলেও তা ছিল আংশিক সত্য। আসল কারণ ছিল দেশীয় কর্তাদের অবহেলা। এমন সুবর্ণসুযোগ হারায় ভারতবর্ষ। এই প্রথম আর এখন অবধি এই শেষ!

ফুটবল বনাম মানুষের দাবি

বিশ্বকাপ চললেও এবারের বিশ্বকাপ আয়োজনে ব্রাজিলে উঠেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পর্তুগীজ ভাষায় 'না তেরা দু ফুতবল সউ উ ফুতবল স্তা এম ক্রাইসি'। অর্থাৎ ফুটবলের দেশে ফুটবলই সঙ্কটে। গত এক বছর ধরে চলছে বিশ্বকাপ আয়োজনের বিরুদ্ধে, প্রচুর খরচের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। যেখানে প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত সেই করিন্থিয়ান্স এরিনা সংস্কারে খরচ হয়েছে ৪২৪ মিলিয়ন ডলার। সংস্কারের কাজ করতে গিয়ে মারা গেছেন ৮ জন নির্মাণকর্মী। লক্ষাধিক মানুষ বিক্ষোভে সামিল হয়ে বলেছেন, 'আমরা চাই না বিশ্বকাপ, চাই বাসস্থান, খাদ্য কর্মসংস্থান।'

সাওপাওলো, রিও ডি জেনিরো, ব্রাসিলিয়া, মানাউস সর্বত্র উঠেছে স্লোগান। অনুরোধ করা হয়েছে কেউ যেন তাদের শহরে না যান। বলা হয়েছে মেগা ইভেন্ট মানে তুমুল মুদ্রাস্ফীতি। যতই এগিয়েছে টুর্নামেন্ট ততই বেড়েছে আওয়াজ। এই বিতর্কে ভাগ হয়ে গেছে ব্রাজিলের বিখ্যাত ফুটবলাররা। একদিকে পেলে, রোনাল্ডো, বেবেতো—বিশ্বকাপ আয়োজক কমিটিতে ব্যস্ত আছেন প্রস্তুতি নিয়ে। অন্যদিকে ১৯৯৪-এর বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিলের রোমারিও ব্রাজিলীয়দের পাশে থেকে বলেছেন, 'কোন ব্রাজিলীয়ই বিশ্বকাপ নিয়ে খুশি নয়। আমরা সবাই জানি যে এখানে বিশ্বকাপ হচ্ছে। এবং আমরা দেশের জন্য বাধ্য হয়েই গলা ফাটাবো। কিন্তু ব্রাজিল তো বিশ্বকাপ হেরে গেছে।' পেলে প্রত্যুত্তরে বলেছেন, 'এই ধরনের বিদ্রোহের ফলে বিশ্বে ব্রাজিলেরই বদনাম হচ্ছে।' রোমারিও আরো বলেছেন, 'যে কোনো সচেতন মানুষই জানেন যে বিশ্বকাপ থেকে সাধারণ মানুষের কোনো লাভ হয় না। কিন্তু তবুও আমরা ব্রাজিলের জন্য গলা ফাটাবো। চিৎকার করবো। কারণ আমরা ব্রাজিলীয় এবং আমরা ফুটবল ভালোবাসি'। পেলেকে অভিহিত করা হয়েছে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে। রোনাল্ডোও (ব্রাজিলীয়) বাদ যায় নি। আগ বাড়িয়ে ফিফার সহ-সভাপতি প্লাতিনি মন্তব্য করেছেন 'ব্রাজিলবাসীর উচিত বিশ্বকাপের সময় এই বিক্ষোভ থামিয়ে রাখা'। এর উত্তরে প্রাক্তন ম্যান ইউ ফুটবলার এরিক ক্যান্টোনা বলেছেন, 'প্লাতিনি শুধু বিশ্বকাপ ভালোয় ভালোয় শেষ হওয়া দেখছেন। কিন্তু ওদের আওয়াজও তো সকলের কাছে পৌছতে হবে।' যদিও আশ্বস্ত করে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ বলছেন, 'ব্রাজিল অতিথিপরায়ণ, ডোন্ট ওরি'। বিতর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই, উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রসঙ্গ। এর মধ্যেই চলছে বিশ্বকাপ।

বর্ণচ্ছটায় ব্রাত্য

একমাসব্যাপী চলতে থাকা এই মহারণে গোটা পৃথিবী ভাগ হয়ে যায় প্রিয়

দলের, প্রিয় দেশের সমর্থনে। মূল পর্বে অংশ নেওয়া দেশের সমর্থকরা আবেগে ভাসবেনই। কিন্তু আমাদের দেশ সহ বাকী পৃথিবীর ফুটবল অনুরাগীরাও বাদ থাকেন না। পশ্চিমবঙ্গ তো নয়ই। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানি, স্পেনের পাশাপাশি পর্তুগাল, ইতালি সমর্থকেরা তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন ভালোবাসায়। সমর্থন তৈরি হয় বিশ্বখ্যাত ফুটবলারদের প্রতি ভালোবাসা থেকে। মেসি থেকে রোনাল্ডো, নেইমার থেকে রবেন এই সময়কালে বিশ্বসফল ফুটবলারদের টানে। কিন্তু এইসময় কে ভুলে যাবে সেইসব ফুটবলারদের কথা দাপিয়ে খেলেও যাদের বিশ্বকাপে খেলা হয়ে উঠলো না নিজের দেশ যোগ্যতাপর্ব না পেরনোর জন্য। চোটের জন্য। এই তালিকায় সবচেয়ে আগে থাকবে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী

ফুটবলার গ্যারেথ বেল (ওয়েলস) ও বিস্ময়কর ফুটবলার প্লাটান ইব্রাহিমোভিচ্ (সুইডেন)-এর নাম। যার অসংখ্য অভাবনীয় গোল বিস্ময় জাগিয়েছে ফুটবল অনুরাগীদের মনে। এছাড়াও অস্ট্রিয়ার দাভিদ আলবা, তুরস্কের আরদা তুরান, সার্বিয়ার ইভানোভিক এর নাম মনে পড়ছে। চোটের জন্য বিশ্বকাপে আসছেন না ইতালির মন্টোলিভো, কলম্বিয়ার ফালকাও সমেত আরো অনেকে। এদের কথা ২০১৪ বিশ্বকাপ ভোলে কী করে?

থিম সং ও ম্যাসকট

২০১০-এর দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের থিম সং সাকিরার 'ওয়াকা ওয়াকা' বিশ্ব মাতিয়েছিল। এবারের থিম সং 'ওলে ওলা' মানে 'উই আর ওয়ান' গেয়েছেন পিটবুল ও জেনিফার লোপেজ এবং ক্লদিয়া লেইটে। ফুটবল বিশ্বকাপের ম্যাসকট অলিম্পিকের আগেই চালু হয়েছিল। '৬৬ সালে প্রথম ম্যাসকট 'উইলি' আত্মপ্রকাশ করে। এবারে দক্ষিণ আমেরিকার শক্ত আঁশের বর্মে ঢাকা সুড়ঙ্গ খননকারী প্রাণী 'আর্মোডিলো'র আদলে ম্যাসকট 'ফুলেকো' এসেছে আমাদের সামনে। কে চ্যাম্পিয়ন হবে এই মহারণে আর ক'দিনের অপেক্ষা। কিন্তু পৃথিবী মজে থাকবে এক মাস জোড়া এই উৎসবে। কিন্তু বহাল থেকে যাবে বিশ্বকাপকে ঘিরে ব্রাজিলে ওঠা প্রশ্নগুলি। ওখানে তো বটেই কিন্তু এখানেও কি নয়? □

১৯৬৬ বিশ্বকাপ ফাইনাল। ইংল্যান্ড বনাম জার্মানি।

বিক্ষোভের নানান কথা

● ২০১৩ জুন মাস। কনফেডারেশন কাপ শুরু হবে দিন কয়েকের মধ্যে। ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরে বাস এবং মেট্রো ভাড়া ০.২০ রিয়াল (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫.৩৬ টাকা) বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামে নাগরিকেরা। তারপর ছড়িয়ে পড়ে নানান শহরে। শুধু বর্ধিত পরিবহন ভাড়া প্রত্যাহার নয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসায় জনপরিষেবায় অপ্রতুলতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ব্রাজিলবাসী। প্রশ্ন ওঠে জনপরিষেবায় ব্যয় কমিয়ে অকল্পনীয় ব্যয়ে কেন অনুষ্ঠিত হবে একের পর এক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। যেমন ২০১৩ কনফেডারেশন কাপ, বিশ্বকাপ ফুটবল (২০১৪) এবং অলিম্পিক (২০১৬)। কনফেডারেশন কাপ ও বিশ্বকাপের জন্য ব্রাজিল সরকারের বরাদ্দ ১৫০০ কোটি ডলার এবং অলিম্পিকের জন্য ১৪০০ কোটি ডলার।

● স্টেডিয়াম এবং অন্যান্য নির্মাণ কাজের জন্য হাজার হাজার পরিবার বাস্তুচ্যুত। যে যে জায়গায় খেলা হবে সেখানে অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের শ্রমিকদের উৎখাত করে রুজি-রোজগার বন্ধ করে ফিফা অনুমোদিত বৃহৎ ব্যবসায়ীরা জায়গা করেছে। ব্রাজিলের প্রান্তিক এবং নিপীড়িত শ্রেণী এই নীতির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করছে। মারাদোনা বলেছিলেন—'বলে দাগ লেগেছে।' (মারিয়ানা আসিস, পাবলিক সেমিনার, ১০ জুন ২০১৪)

● **পিউ রিসার্চ সেন্টার-এর সমীক্ষা পেশ করেছে কিছু তথ্য**

(১) ব্রাজিলে বর্তমানে যা চলছে, তাতে ৭২ শতাংশ ব্রাজিলীবাসী অসন্তুষ্ট। (২) ৬৭ শতাংশের অভিমত ব্রাজিলের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, ৩২ শতাংশের মতে ভালো। (৩) ৬১ শতাংশের বক্তব্য বিশ্বকাপ অনুষ্ঠান ব্রাজিলের পক্ষে মন্দ, কারণ এই অনুষ্ঠান শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জনপরিষেবা খাতের অর্থ টেনে নিচ্ছে। ৩৪ শতাংশ বলছে তাতে ৩৫ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং আরো কাজ সৃষ্টি করে অর্থনীতির উপকার করবে। (৪) ৪৭ শতাংশ প্রতিবাদের স্বপক্ষে, কারণ তারা মনে করে ব্রাজিলের সমস্যাগুলি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ৪৮ শতাংশ প্রতিবাদ চালানোর বিরুদ্ধে। তাদের অভিমত এর ফলে বিশ্বের দরবারে ব্রাজিলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। □

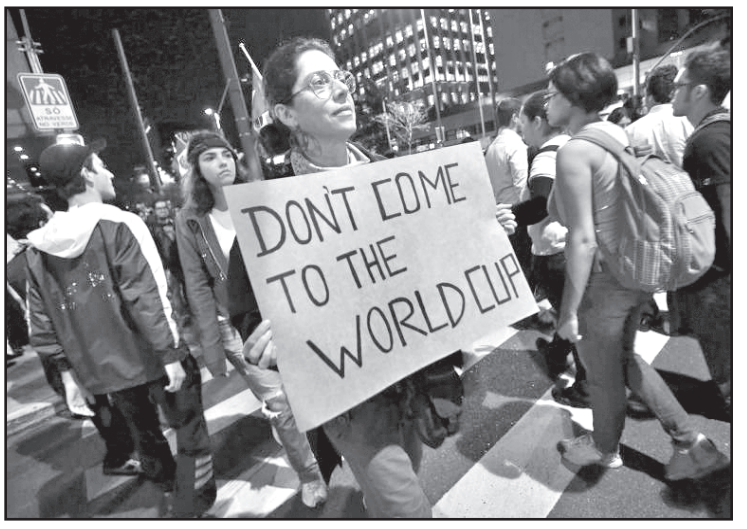

দুখু মিঞা

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

লিখেছিলেন—অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, সর্বহারা, ছাত্রদলের গান, সাম্যবাদী, ফরিয়াদ ইত্যাদি ইত্যাদি।

হঠাৎই তাঁর জীবনে আরো অন্ধকার নেমে আসে, তিনি ক্ষতবিক্ষত হন যখন ১৯২৮ সালে তাঁর প্রাণের প্রিয় পুত্র বুলবুল 'স্মল পক্স'-এ মারা যায়। তিনি হতবাক হয়ে যান, ভুলতে পারেন না বুলবুলকে। তাকে নিয়ে লেখেন অনেক গান। উল্লেখযোগ্য হল—''শূন্য এ বুকে পাখী মোর আয়, ফিরে আয় ফিরে আয়...।'' সেই বছরেই তাঁর তৃতীয় পুত্র কাজি সব্যসাচীর জন্ম হয় এবং ১৯৩১ সালে কাজি অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করে। তিনি আরো ভেঙে পড়েন ১৯৪১ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়।

১৯৪২ সালে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে কোনো এক অজানা রোগে তিনি তাঁর স্মৃতি ও বাক্‌শক্তি হারান। কথিত আছে কারাগারে থাকার সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে slow poisoning করেছিল। পরে অবশ্য ভিয়েনার একটি চিকিৎসক দল 'Morbus Pick' নামক একটি রোগ নির্ণয় করেন যা দ্বারা তিনি আক্রান্ত। ইহা একটি বিরল নিউরোডিজেনারেটিভ ডিজিজ (Neurodegenerative disease), যা সহজে ভালো হয় না। এই রোগের কারণে কবি বহু বছর নিজেকে ঘরবন্দী করে অন্যদের থেকে আলাদা করে রেখেছিলেন।

১৯৭১ সাল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। তখন নজরুল থাকতেন ক্রিস্টোফার রোডে। বিভিন্ন ক্লাবের ছেলেমেয়েরা ড্রাম, বিউগল বাজিয়ে গাইছে ''চল্ চল্ চল্ ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল...।'' মাইকে শোনা যাচ্ছে আবৃত্তি—

''মশা মেরে ঐ গরজে কামান—বিপ্লব মারিয়াছি।
আমাদের ডান হাতে হাত কড়া, বামহাতে মারি মাছি।''

লাইন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মানুষ যাচ্ছে তাঁকে দেখতে। একটি ফরাসের মাঝখানে বসে আছেন কবি। কবি কিছুই দেখছেন না, কিছুই শুনছেন না। তিনি তখন মূক ও বধির। কে যেন বাইরে গেয়ে উঠল তাঁরই লেখা গান—''ফুলের জলসায় নীরব কেন হে কবি...।'' সেদিন ছিল তাঁর জন্মদিন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের নতুন সরকার তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেয় এবং বাংলাদেশে নিমন্ত্রণ জানালে ১৯৭২ সালে তিনি স্বপরিবারে বাংলাদেশে চলে যান। মূকবধির অবস্থাতেও তিনি বহু গান, কবিতা, উপন্যাস লেখেন। সারা জীবনে তিনি প্রায় চার হাজার গান লিখেছেন ও সুর দিয়েছেন। নজরুল শুধু মুসলমানের নয়, শুধু হিন্দুর নয়। তিনি ছিলেন নব্য বাংলার প্রধান মুখপাত্র। তাই তিনি সমগ্র বাঙালী জাতির জন্য লিখতে পেরেছিলেন—''মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান...।'' শুধু গান-কবিতা নয় তিনি অভিনয়ও করতেন স্বচ্ছন্দভাবে। একসময় 'ধ্রুব' নামে একটি সিনেমাতে তিনি নারদের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং সেই ছবিতে তিনি গানও করেছিলেন। সেই সময় তাঁর গাওয়া ''বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্ নে আজি দোল...'', এই গানটি ছিল সকলের মুখে মুখে।

কাজি নজরুল ইসলাম ওরফে দুখু মিঞার জীবন সত্যি খুবই দুঃখের, কিন্তু এর মধ্যেও তিনি আমাদের সকলের হৃদয়ে তাঁর গান, কবিতা, গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে অনেক সুখের ছোঁয়া, মধুর স্মৃতি রেখে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট বাংলাদেশের ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। □

রক্তদান কর্মসূচী

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত অন্যতম সংগঠন **পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন-এর** স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী ১৮ জুন '২০১৪ স্বাস্থ্যভবন ও নবমহাকরণ ক্যান্টিন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটি অঞ্চলে ২ জন মহিলা সহ মোট ১১৭ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। এর মধ্যে নবমহাকরণে রক্তদান করেন ৫৪ জন এবং স্বাস্থ্যভবনে ৬৩ জন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে ব্লাডব্যাঙ্কে যখন রক্তের অভাব দেখা দেয় সেই সময়েই সমিতি রক্তদানের মতো সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী প্রতিপালন করে।

স্বাস্থ্যভবন ও নবমহাকরণে প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত সভায় কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সহ-সম্পাদক যথাক্রমে বিজয় শংকর সিনহা ও বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী। স্বাস্থ্যভবনের কর্মসূচীতে সমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিদ্যুৎ চ্যাটার্জী ও নব-মহাকরণে যুগ্ম সম্পাদক অমর চক্রবর্তী। নবমহাকরণে সভা পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, সহ-সভাপতি কাকলি পাল এবং স্বাস্থ্যভবনে অপর সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সহ বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি **লবণহ্রদ অঞ্চলের** উদ্যোগে সেচভবন লনে কর্মচারী সমাবেশের মধ্য দিয়ে ২৬ জুন ২০১৪, বেলা ১২টায় 'রক্তদান কর্মসূচী' অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দেবব্রত রায়। সভাপতিত্ব করেন অঞ্চলের সভাপতি শ্যামল সরকার। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্কের সহ স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ শেখরেন্দ্র নাথ ভৌমিক এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেচভবন প্রজেক্টের বিশেষ বাস্তুকার শ্রী তেজেন্দ্র নারায়ন সোম সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। রক্তদান করেন ৪ জন মহিলাসহ ৫২ জন সদস্য বন্ধু। কর্মসূচী উপলক্ষ্যে লবণহ্রদ অঞ্চলে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা যায়। □

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের আহ্বানে যৌথ কনভেনশন

(প্রথম পাতার পর)

সংগ্রাম আন্দোলনের পথেই অগ্রসর হবে বলেই তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এই কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পেশ করেন সি আই টি ইউ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত। তিনি বলেন রাজ্যে নতুন শিল্প গড়ে ওঠা তো দূরের কথা বর্তমানে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ফলে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়ে পড়ছেন এবং অসংখ্য শ্রমিক কর্মচারী কর্মহীনতার আশঙ্কায় বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন। মালিকরা নিয়মিত শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছেন না। স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত করে সমকাজে সমবেতনের কনট্রাক্ট লেবার আইন অগ্রাহ্য করছে। শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই এবং গ্র্যাচুইটির টাকা আত্মসাৎ করছে মালিক পক্ষ। রাজ্যের শাসকদল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকদের পক্ষ অবলম্বন করছে ফলে শ্রমিক শ্রেণীর সামনে এক কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গত ছয় মাস ঐতিহ্যশালী হিন্দমোটর কারখানার ২৩০০ কর্মী বেতন পাচ্ছেন না। ২৪ মে সাসপেনশন অব ওয়ার্কস-এর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ১৫ মে জেশপ কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গত ৭ মাস কর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না। গত ৩৪ মাস যাবৎ ডাকব্যাক কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। ডানলপ কারখানা দীর্ঘদিন বন্ধ। এম এ এম সি, হিন্দুস্থান কেবলস্ বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, ইনচেক টায়ার সহ অসংখ্য ছোট মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে আছে। বেশিরভাগ চটকল বন্ধ, বহু চা বাগান বন্ধ, শ্রমিকরা অনাহারে আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। মালিকরা কোনো শ্রম আইন মানছে না। রাজ্যের শাসক দল ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী মনোভাব মালিকদের শ্রম আইন ভাঙতে উৎসাহিত করছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া, বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করছে না রাজ্য সরকার।

এহেন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন ছাড়া বিকল্প কোনো পথ শ্রমিক কর্মচারীদের নেই। কনভেনশনে উত্থাপিত প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১ জুন ২০১৪ বিকেল ৫টায় কলকাতায় ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ মিছিল করবে। দূরবর্তী জেলাগুলি যৌথভাবে মিছিল করবে। (মিছিলের রিপোর্ট প্রথম পৃষ্ঠায়)।

এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন এ আই টি ইউ সি-র পক্ষে রণজিৎ গুহ, আই এন টি ইউ সি-র পক্ষে রমেন পাণ্ডে, এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষে বাসুদেব বোস, টি ইউ সি সি-র পক্ষে সরল দেব, এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে দিলীপ ভট্টাচার্য, ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে তপন দাশগুপ্ত, এইচ এম এস-র পক্ষে সমীর রায় এবং ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে বরুণ চৌধুরী। □

সুব্রত কুমার গুহ

সমিতিগত বিক্ষোভ কর্মসূচী, ডেপুটেশন

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড অ্যানিম্যাল হাসব্যান্ড্রী ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে ১২ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ৭ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ ২০১৪ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

গত ৭ মার্চ নদীয়া জেলার কর্মচারীদের উপস্থিতিতে হরিণঘাটা ফার্মে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অমল সরকার, নদীয়া জেলার যুগ্ম সম্পাদক শুভাশিস চক্রবর্তী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের উৎসাহিত করেন এবং জয়েন্ট ডিরেকটরের কাছে স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। মূল কর্মসূচী হয় ১৩ মার্চ কলকাতায় বেলগাছিয়ার সেন্ট্রাল ডেয়ারীতে। এই সমাবেশে বর্ধমান, দুর্গাপুর সহ কলকাতার কর্মচারী এবং বেশ কিছু ডিপো কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এই সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি অসিত গায়েন, নারায়ণ চন্দ্র দে, দীপক বিশ্বাস। কলকাতার এই কেন্দ্রীয় সমাবেশে রাজ্যে কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় প্রথমে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অমল সরকার, অসিত ভট্টাচার্যের হাতে ফুলের স্তবক তুলে দিয়ে সম্বর্ধিত করেন। পরবর্তীতে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক অভিজিৎ রায় চৌধুরী ১২ দফা দাবি প্রস্তাবটি প্রাঞ্জল ভাষায় উত্থাপন করেন। অবর দুগ্ধ মহাধ্যক্ষের নিকট এই দাবি প্রস্তাবসহ স্মারক লিপি প্রদান করতে যান সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে ১২ জন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। উপস্থিত প্রায় তিন শতাধিক কর্মচারীদের দৃপ্ত মিছিল সংগঠন দপ্তর থেকে বেলগাছিয়ার সেন্ট্রাল ডেয়ারীর ভিতর প্রবেশ করে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডেয়ারী ছোট করার লক্ষ্যে গৃহীত বর্তমান সরকারের নীতিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং ডেয়ারী শিল্পের বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধভাবে আরো জোরালো আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, একই সাথে শ্রমিক কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধ লড়াই সংগ্রাম করতে হবে। এবং আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে বর্তমান রাজ্য সরকারের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিবার পরিজন নিয়ে সামিল হতে হবে। পরে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অমল সরকার স্মারকলিপির দাবিগুলির মধ্যে অর্জিত বিষয়গুলি উল্লেখ করেন এবং সংগঠনের উদ্যোগে আগামীদিনে যে লড়াই সংগ্রাম হবে তাতে সমস্ত কর্মচারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের আহ্বান রাখেন।

সর্বশেষে সভাপতি সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন। □

রাজ্যের বন্ধ হয়ে যাওয়া সমস্ত কলকারখানা ও চা বাগানগুলি খোলার দাবিতে ৩ জুন, ২০১৪ কলকাতায় অনুষ্ঠিত কনভেনশনের প্রস্তাব

এই কনভেনশন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠা তো দূরের কথা বর্তমানে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। মালিকরা নিয়মিত শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছেন না। শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। স্থায়ী কাজে, অস্থায়ী শ্রমিক নিযুক্ত করা হচ্ছে। আবার কনট্রাক্ট লেবার আইন অনুযায়ী সমকাজে সমবেতন সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে না। শ্রমিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই, গ্র্যাচুইটির টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। শ্রম আইন মানা হচ্ছে না। অথচ রাজ্যের শাসক দলের লোকেরা মালিকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মদত দিচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের শ্রমদপ্তর নীরব। রাজ্য সরকার স্পষ্টতঃই প্রায় সবক্ষেত্রেই মালিকদের পক্ষ অবলম্বন করছেন। কার্যত সমগ্র দেশ সহ রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণীর সামনে এক কঠিন পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। হিন্দ মোটর কারখানার ২৩০০ কর্মী গত ছয় মাস বেতন পাচ্ছে না। ২৪ মে সাসপেনশন অব ওয়ার্কস-এর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গত ২৮ মে হিন্দুস্থান মোটর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে রাজ্য সরকারের পক্ষে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন হিন্দ মোটরের বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের এককালীন মাথাপিছু সামান্য কিছু অর্থ দেওয়া হবে। কারখানাটি খোলার জন্য রাজ্য সরকারের কোনো ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এক সময়ে কোম্পানীর পক্ষে থেকে আরও দুটি নতুন গাড়ি বাজারে আনার কথাও বলা হয়েছিল। হিন্দুস্তান মোটর্স-এর পুনরুজ্জীবনের জন্যে জমি বিক্রি করে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় না করে কর্তৃপক্ষ বর্তমানে কাঁচা মালের মূল্যবৃদ্ধি, গাড়ি পিছু উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, মূলধন ও ক্যাশ ফ্লো কম সহ বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কারখানা না চালানোর কথা বলছেন। শোনা যাচ্ছে গত ফেব্রুয়ারি মাসে কারখানাটিকে রুগ্ন সংস্থা হিসাবে ঘোষণার জন্যে বি আই এফ আর-এর কাছে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে কোনো আলোচনা করা হচ্ছে না।

জেশপ কারখানা ১৫ মে নির্বাচনের অব্যবহিত পর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। জেশপের শ্রমিকরা গত ৭ মাস বেতনহীন অবস্থায় সাসপেনশন অব ওয়ার্কস এর খাঁড়া মাথায় নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কারখানার গেটে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে উৎপাদন বন্ধ, বেতন বন্ধ, সমাজ বিরোধীরা কারখানার মেশিন ও যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন নীরব। শ্রমিকরা বারবার থানায় ও প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনো কাজ হচ্ছে না। কার্যতঃ এই শিল্পটিকে স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্বে পরিণত করতে গভীর চক্রান্ত চলছে। সম্প্রতি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মালিককে বলেছেন কারখানা বন্ধ করে জমি ফেরৎ দিয়ে চলে যান। মালিকও তাই চাইছে।

এই কনভেনশন স্মরণ করছে ২০০৯ সালে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের রেলমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন রেলদপ্তর জেশপ অধিগ্রহণ করবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। এখনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিছুই করছেন না। একইভাবে ডানলপ কারখানাটিও দীর্ঘদিন বন্ধ। সাত বছর হয়ে গেল, বার বার খুলবে বলেও কিছু হচ্ছে না। ডাকব্যাকে গত ৩৪ মাস বেতন বন্ধ। শ্রমিকদের মাইনেই হচ্ছে না। শ্রমিকদের ভি আর এস দেওয়া হচ্ছে। টেক্সমেকো-তেও এক বছর উৎপাদন বন্ধ, শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছে না। দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলে এম এ এম সি, হিন্দুস্থান কেবল্‌স্, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড দীর্ঘদিন বন্ধ। উত্তর ২৪ পরগণার ইনচেক টায়ারসহ বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলিতে বহু ছোট ও মাঝারি শিল্প বন্ধ। রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া ৪২ শতাংশ মহার্ঘভাতা বন্ধ করে ঐ দাবিতে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের বেশিরভাগ চটকলে শ্রমিকরা পুরো কাজ পাচ্ছে না, ৪ দিন বা ৫ দিনের সপ্তাহ চালু করা হয়েছে। চা বাগানের শ্রমিকরা কর্মচ্যুত হচ্ছে, আত্মহত্যা করছে, বেশ কয়েকটি চা বাগান বন্ধ। টি-প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট ও টি-অ্যাক্ট অনুযায়ী স্ট্যাটুইটারী বেনিফিট, ন্যূনতম মজুরীও শ্রমিকরা পাচ্ছে না। পরিবর্তনশীল সূচক সাপেক্ষে ডি এ প্রদান পদ্ধতি মালিকরা মানছে না। কার্যত মালিকরা কোনো শ্রম আইনই মানছেন না। একইভাবে শাসকদল ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী মনোভাব মালিকদের শ্রম আইন ভাঙতে উৎসাহিত করে চলেছে। আসলে গত প্রায় আড়াই দশক ধরে উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের যে পথ কেন্দ্রীয় সরকার দেশে এবং কয়েকটি রাজ্যের সরকার অনুসরণ করেছে, বর্তমান রাজ্য সরকারও একই নীতি অনুসরণ করছে, যা শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী। রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পরিবহন শিল্পের শ্রমিকেরা চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন সংগ্রাম করেও রাজ্য সরকারের নেতিবাচক ভূমিকায় অবহেলিত হয়েছে। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন এন ডি এ সরকার তৎপরতার সঙ্গে ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ, প্রতিরক্ষায় বিদেশী বিনিয়োগ উন্মুক্ত করার পথে এগোচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আলোচনা ও কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে আজকের এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে।

দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রস্তুতিতে এই কনভেনশন রাজ্যের শ্রমজীবী জনগণকে নিম্নে উল্লেখিত আশু কর্মসূচী সমূহে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে ঃ (১) আগামী ১১ জুন, ২০১৪ বিকাল ৫টায় কলকাতায় কেন্দ্রীয় মিছিল ও দূরবর্তী জেলাগুলি যৌথভাবে মিছিল করা।(২) কনভেনশনে আলোচনার ভিত্তিতে আরও বিস্তৃত কর্মসূচী নেওয়া হবে। □

পরিবেশ দিবসের কিছু দুর্ভাবনা

প্রণব কর

ক্রমবর্ধমান দূষণের ফলে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কায় ১৯৭২ সালের ৫ জুন থেকে ১৬ জুন টানা বারো দিন ধরে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে পৃথিবীর প্রথম বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলন থেকেই ঠিক হয়েছিল যে সম্মেলন শুরুর দিনটিকেই অর্থাৎ ৫ জুন দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস' হিসেবে প্রতি বছর পালন করা হবে।

যে ব্যাপক মাত্রায় পরিবেশ দূষণ চলছে তা নিয়ে আজ সারা পৃথিবীই চিন্তিত। পরিবেশ দূষণের পিছনে বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাই দায়ী। মুনাফা কেন্দ্রীক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ভোগলিপ্সার মধ্যেও নিহিত আছে বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন সহ সমস্ত ধরনের পরিবেশ দূষণের বীজ।

ভারতের শাসকবর্গের পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে উদাসীনতার দিকটিই আমরা বর্তমান আলোচনার মধ্যে আনতে চাইবো। গত বছরের পরিবেশ দিবস থেকে বর্তমান বছরের পরিবেশ দিবস-এর মধ্যবর্তী সময়কালের মধ্যে আমরা যদি নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলির শিল্পায়ন সংক্রান্ত কর্মসূচীগুলি একটু খুঁটিয়ে দেখি তাহলেই পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে সরকারের তীব্র অনীহার চিত্রটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যা কিনা আসলে পুঁজিপতিদেরই স্বার্থ রক্ষা করে।

২০১৩ সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই বিগত ইউপিএ-২ সরকারের বিরুদ্ধে নীতিপঙ্গুত্বের অভিযোগ উঠতে থাকে। বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে সরকার ব্যর্থ হচ্ছে বলে শিল্পপতিদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠতে থাকে। ফলে ইউপিএ-২ সরকার এই অপবাদ ঘোচাতে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র পেতে বিভিন্ন প্রকল্পের দেরী হচ্ছে বলে শিল্পে বিনিয়োগ ঠিকমতো হচ্ছে না বলে অভিযোগ ওঠায় ২১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বনদপ্তরের মন্ত্রী জয়ন্তী নটরাজনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় সংগঠনের কাজ করানোর অছিলায়। তার স্থলে পরিবেশ মন্ত্রকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রকের মন্ত্রী এম বীরাপ্পন মইলি। মজার বিষয় হল পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকেরই বেশ কিছু প্রকল্প পরিবেশ মন্ত্রক আটকে রেখে দিয়েছিল।

বীরাপ্পন মইলি পরিবেশ ও বন দপ্তরের মন্ত্রী হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যেই ১.৮ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের ৭৩টি প্রকল্পকে ছাড়পত্র দেন যেগুলি পূর্ববর্তী মন্ত্রী আটকে রেখেছিলেন। বিনিয়োগের নেশায় বুদ হয়ে থাকা সরকারের কাছে পরিবেশ দূষণ যে কোনো গুরুত্বই পায় না সমগ্র ঘটনাবলী তার নিদর্শন। মইলি যে প্রকল্পগুলিতে পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র দিয়েছেন তার মধ্যে অত্যন্ত বিতর্কিত পস্কো ইস্পাত প্রকল্পটিও রয়েছে।

কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রক কোনো প্রকল্পে ছাড়পত্র দেবার আগে এক্সপার্ট এপ্রাইজাল কমিটি (EAC) এবং ফরেস্ট অ্যাডভাইসরি কমিটির (FAC) সুপারিশগুলি দেখে নেয়। এই দুটি কমিটি সম্মতি দিলে তবেই পরিবেশ ও বন দপ্তর প্রকল্পের ছাড়পত্র দেয়। EAC আবার তার প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাড় করে এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট (EIA) রিপোর্ট থেকে। ন্যাশনাল গ্রীণ ট্রাইবুনাল (NGT) বিভিন্ন ক্ষেত্রেই EAC-এর ব্যর্থতার দিকে আলোকপাত করেছে। EAC অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকল্পগুলির বিষয়ে বিশদে তদন্ত না করেই রিপোর্ট জমা দেয় এবং অধিকাংশ প্রকল্পই ছাড়পত্র পায়। পরিবেশের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক এমন সামান্য কিছু প্রকল্পই ছাড়পত্র পেত না। কিন্তু সরকার বিনিয়োগ বান্ধব হতে গিয়ে সে বাধাটুকুও তুলে দেবার জন্য তড়িঘড়ি পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রীকেই বদলে ফেলে।

বীরাপ্পন মইলি মন্ত্রী হয়েই পরিবেশের উপর কি প্রভাব পড়বে তার তোয়াক্কা না করে পস্কো স্টীল প্ল্যান্টের অনুমোদন দিলেন। পস্কো স্টীল প্ল্যান্টের জন্য যে গণশুনানী হয় সেখানে বলা হয় যে প্ল্যান্টটির উৎপাদন ক্ষমতা হবে 8 mtpa (মেট্রিকটন পার অ্যানাম), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার উৎপাদন ক্ষমতা হবে 12 mtpa। ফলে ব্যাপক পরিবেশ দূষণ হবে এর থেকে। কিন্তু পরিবেশ মন্ত্রীর তা নিয়ে কোনো হেলদোল ছিল না।

ইতিমধ্যেই তিস্তা-IV প্রকল্পের কাজ শুরু হতে চলেছে। এর ফলে তিস্তা তীরবর্তী কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্কটি ডুবে যাবে। প্রায় ৭৬০০টি গাছ ধ্বংস হয়ে যাবে। ১৪টি গ্রাম, বিপন্ন হয়ে পড়বে, যাদের মোট লোকসংখ্যা ১৮ হাজারের উপরে। এসব সত্ত্বেও EAC এই প্রকল্পটিতে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র দিয়েছে।

এ বছর ২২ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রক উত্তরাখণ্ডে যমুনা নদীর উপর লাখোয়ার বহুমুখী জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্পটির চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি পাহাড়ী অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটায় এবং উত্তরাখণ্ডে গত বছরের জুন মাসে বন্যায় কেদারনাথ সংলগ্ন অঞ্চলে পাহাড় ভেঙ্গে নেমে এসে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। তার পরবর্তীকালে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় পরিবেশ দপ্তর এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছিল কোনো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে। ছাড় পত্র না দিতে। তা সত্ত্বেও লাখোয়ার প্রকল্পটিকে পরিবেশ মন্ত্রক ছাড়পত্র দিল।

আবার খনিজ পদার্থ উত্তোলনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক পরিবেশ দূষণ ঘটে। কিন্তু নব্য উদার অর্থনীতির যুগে খনিজ পদার্থ লুটের প্রতিযোগিতা চলছে। আরও বৃহৎ আকারে এই লুটের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য গত ১৪ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক সিদ্ধান্ত নেয় যে বর্তমানে চালু কয়লা-উত্তোলন প্রকল্পগুলিতে উৎপাদন ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। এক্ষেত্রে কোনো গণশুনানী হবে না। এর জন্য প্রচুর বিস্ফোরক ব্যবহৃত হবে, বাতাস দূষিত হবে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হবে, এমনকি পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু বিনিয়োগ বড় দায়।

এর পাশাপাশি আমরা যদি গুজরাট রাজ্যের দিকে চোখ ফেরাই তবে সেখানেও শিল্পায়নের নামে ভয়ানক পরিবেশ দূষণের চিত্র আমরা দেখতে পাব। শিল্পায়নের নামে গুজরাটে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল দখলের কাজ শুরু হয়েছিল ১৫ বছর আগে। বর্তমানে সেখানে ৪১টি বন্দর, বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বেশ কিছু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে। মুন্দ্রাকে কেন্দ্র করেই এই শিল্পাঞ্চলটি গড়ে ওঠে। এর ফলে এই অঞ্চলের জেলেদের মাছ ধরা এবং কৃষকদের গোচারণভূমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলে লবণ উৎপাদনের কাজও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছের শিল্পপতি গৌতম আদানী এই অঞ্চলে আদানী পোর্টস এন্ড স্পেশাল ইকোনোমিক্স জোন লিমিটেড (APSEZL) তৈরি করেন পরিবেশ দূষণের তোয়াক্কা না করেই। এই প্রকল্প ঘিরে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত ব্যাপক অভিযোগ ওঠায় সুনীতা নারায়নের নেতৃত্বে একটি দল সেখানে গিয়ে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত ব্যাপারে পরীক্ষা চালায়। দলটি পরীক্ষা করে জানায় যে আদানীদের এই প্রকল্পটি ঐ অঞ্চলের বহু খাঁড়ি এবং ম্যানগ্রোভ গাছ ধ্বংস করেছে। এই তদন্ত রিপোর্ট-এর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রক আদানীদের উপর ২০০ কোটি টাকার জরিমানা করেছে। যদিও পরিবেশ মন্ত্রকের এই পদক্ষেপ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। পরিবেশবিদরা বলছেন টাকার বিনিময়ে যদি পরিবেশ ক্ষতির দায় থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তবে পরবর্তীকালে শিল্পপতিরা এই পন্থাই গ্রহণ করবেন। আদানীদের পছন্দের ব্যক্তি বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। ফলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে আগামী দিনেও ভারতে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধিই পাবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ এই পৃথিবীর সমগ্র জীবজগতের সাধারণ সম্পদ। মুনাফাকেন্দ্রীক বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় এই সাধারণ সম্পদকে কিছু মানুষ কুক্ষিগত করে মুনাফা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলে দূষণ মুক্ত পৃথিবী গড়তে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাটাকেই উপড়ে ফেলতে হবে। এই লড়াইয়ে পরিবেশ রক্ষার লড়াইকে যুক্ত করার অঙ্গীকার হবে আমাদের, যাতে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটা দূষণমুক্ত পৃথিবী উপহার দিয়ে যেতে পারি। □

ভয়াবহ জলসঙ্কটের দিকে কলকাতা

সারা পৃথিবীতে চাহিদার তুলনায় জলের যোগানের অপর্যাপ্ততার দিক দিয়ে পৃথিবীর প্রথম ১০টি বড় শহরের মধ্যে অন্যতম হল কলকাতা। সম্প্রতি 'নেচার কনজারভেন্সি' নামক একটি মার্কিনী সংস্থার সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক জার্নাল 'গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ'-এ এই সমীক্ষাটি প্রকাশিত হয়েছে। একটি মার্কিনী সংস্থার বিজ্ঞানীর দল সারা পৃথিবীর ৫০০টিরও বেশি শহরে সমীক্ষা চালিয়ে এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন। প্রবীণ বিজ্ঞানী রব ম্যাক্‌ডোনাল্ড-এর নেতৃত্বে বিজ্ঞানীদের দলটি এই প্রথমবার সারা পৃথিবীর বড় শহরগুলির জল পরিকাঠামোর একটা আন্তর্জাতিক চিত্র তুলে ধরেছে। সমীক্ষা অনুযায়ী যে দশটি বড় শহর সর্বাপেক্ষা জলসঙ্কটের সম্মুখীন সেগুলি হল— টোকিও, দিল্লী, মেক্সিকো সিটি, শাঙহাই, বেজিং, কলকাতা, করাচি, লস এঞ্জেলেস, রিও ডি জেনেইরো এবং মস্কো।

রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে করা ওয়ার্ল্ড আরবানাইজেশন প্রোগ্রেস রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত এই সমীক্ষায় সাড়ে সাত লক্ষের বেশি মানুষের মতামত নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক টাস্ক ফোর্স-এর চেয়ারম্যান কে জে নাথ এই সমীক্ষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন শহরবাসীর জন্য যে জল সরবরাহ করে তা পর্যাপ্ত নয়, তাই অধিকাংশ মানুষ মাটির তলার জলের উপর নির্ভরশীল। তিনি আরও বলেন জলাশয়ে জলস্তর বিগত একদশকে ৭০ থেকে ৮০ ফুট নীচে নেমে গেছে। বিভিন্ন কারখানা ও বহুতল নির্মাণের ফলে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে মাটির গভীরের জল ব্যবহার এর অন্যতম কারণ। এর কারণে জলে আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে শহরের বালিগঞ্জ, যাদবপুর প্রভৃতি জায়গায়।

সমীক্ষাকারী দলটি শহরগুলির জলসঙ্কটের ভিত্তি ঠিক করেছে মোট প্রাপ্ত জলের ন্যূনপক্ষে ৪০ শতাংশ ব্যবহার করাকে। প্রখ্যাত নদী বিশেষজ্ঞ কল্যান রুদ্র বলেছেন যে, প্রাকৃতিকভাবে জল সঞ্চয়ের জন্য মাত্র ৬ শতাংশ উন্মুক্ত অঞ্চল এই মুহূর্তে কলকাতায় রয়েছে। এর জন্য বৃষ্টির জলের একটা বড় অংশ মাটির নিচে জমা হতে পারে না, অন্যভাবে নষ্ট হয়। অথচ দেশের অন্যান্য অংশে ২১ শতাংশ বৃষ্টির জল মাটির নীচে জমা হয়। সমীক্ষা আরও বলছে বড় শহরগুলির অধিবাসীর ৫ জনের ৪ জন (১.২১ বিলিয়ন মানুষ, ৭৮%) প্রাথমিকভাবে ভূপৃষ্ঠের জলের ওপর নির্ভর করে। বাকিদের ২০% মাটির নিচের জল ও ২% সমুদ্রের জলের ওপর নির্ভরশীল। □

মানস কুমার বড়ুয়া

শোক সংবাদ

মধুসুদন বাগচী

কর্মচারী আন্দোলনের নেতা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ-সভাপতি কমরেড মধুসুদন বাগচী গত ২৫ জুন '১৪ ভোর ৩টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তাঁর স্ত্রী এক পুত্র ও কন্যা বর্তমান। তাঁর কন্যা রূপা বাগচী কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বিরোধী দলনেত্রী।

কর্মজীবনে ছয়ের দশকের গোড়ার দিকে কমরেড মধুসুদন বাগচী কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদের দায়িত্বে ছিলেন। এরপর ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সপ্তম রাজ্য সম্মেলন থেকে তিনি সংগঠনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। অবসর গ্রহণের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সহ-সভাপতি হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মৃত্যু সংবাদ পেয়েই বেঙ্গল কেমিক্যাল সংলগ্ন যোগোদ্যান লেনস্থিত কমরেড বাগচীর বাড়ি গিয়ে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য। এছাড়াও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করার পর শেষকৃত্যের জন্য তাঁর মরদেহ কাশীনাথ মিত্র শ্মশান ঘাটে নিয়ে গেলে সেখানে মাল্যদান করেন কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুনির্মল রায় এবং পেনশনার্স সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। ঐ দিনই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। □

স্বপন সেনগুপ্ত

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কলকাতা পূর্বাঞ্চলের প্রাক্তন সহ-সভাপতি তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির কলকাতা পূর্ব-জেলার প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড স্বপন সেনগুপ্ত গত ২৬ জুন, ১৪ রাত্রি ১টা ২০ মিনিটে একটি বেসরকারী হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। ঐদিনই কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। কমরেড সেনগুপ্তকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সহ বহু কর্মী-সংগঠক কেওড়াতলা শ্মশানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

কমরেড স্বপন সেনগুপ্ত ১৯৮২ সালের ২৭ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন বাণিজ্য কর দপ্তরে নিম্নবর্গীয় করণিক হিসাবে চাকুরী জীবন শুরু করেন। চাকুরীতে যোগদানের সময় থেকেই তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির সদস্য হয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি সমিতির কলকাতা পূর্ব জেলার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কলকাতা পূর্বাঞ্চলের সহ-সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। ২০০৯ সালের ৩১ জানুয়ারি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার হিসাবে চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করার পরও তিনি সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচীতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন।

গত ১৪ জুন জ্বর ও কিডনীতে সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হন। প্রায় ১২ দিন ধরে চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড সেনগুপ্তের সহধর্মিনী ও একমাত্র পুত্র বর্তমান। □

আন্তর্জাতিক সংবাদ

(অষ্ঠম পৃষ্ঠার পর)

ইউক্রেন থেকে পৃথক হওয়ার পক্ষে সে দেশের অনেক অঞ্চল

ক্রিমিয়ার মানুষ পূর্বেই গণভোটের মধ্য দিয়ে ইউক্রেন থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। ক্রিমিয়ার পর স্যোনেৎস্ক ও লুহানস্কের মানুষও একই রায় দিলেন। বিগত ১২ মে ঐ দুই অঞ্চলে অনুষ্ঠিত গণভোটে স্যোনেৎস্কের ৮৯ শতাংশ এবং লুহানস্কের ৮৬ শতাংশ মানুষই পৃথক হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন ইউক্রেন সঙ্কটকে ঘিরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবকে গুরুত্ব দিয়ে এই গণভোট আপাতত স্থগিত রাখতে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু গণভোটের আয়োজকগণ এবং এই দুই অঞ্চলের মানুষ সরাসরি তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন এই ভোটকে অবৈধ, জালিয়াতি বলেছে। কিন্তু ভোট উপলক্ষে জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। গণভোটে অংশ নিয়ে বিপুল সংখ্যক ভোটার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নেবেন না বলেও জানিয়ে দেন। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সের্গেই লাভরভ জানিয়ে দিয়েছেন যে ইউক্রেন প্রশ্ন এবং গণভোট বিষয়ে পশ্চিমী উদ্যোগকে ঘিরে কোনো আলোচনায় বসতে রাজি নয় রাশিয়া। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ''স্যোনেৎস্ক ও লুহানস্কের অধিকাংশ মানুষের মতকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁরা অধিক আগ্রহী।'' অপরদিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সংস্থার সহকারী মহাসচিব আইভান সেমোনোভিক বি বি সি-র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ইউক্রেনের বর্তমান পরিস্থিতি নব্বই দশকের ক্রোয়েশিয়া যুদ্ধের কথা স্মরণ করাচ্ছে। □

মানস কুমার বড়ুয়া, পরমেশ দে

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
43rd Year 2nd Issue, June 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

আন্তর্জাতিক সংবাদ

গৃহযুদ্ধের মুখে ইরাক

২০০৩ সালের আগ্রাসন পরবর্তী পর্বে দীর্ঘ সময় ধ্বংসলীলা ও দখলদারি চালিয়ে অনুগত সরকারের হাতে ইরাকের শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়ে ২০১১-এর শেষের দিকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়া শুরু হয়। যুদ্ধ ও সংঘাতে জীর্ণ-দীর্ণ দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু দেশ ইরাকে জাতি-বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে

প্রত্যাবর্তন করে আমেরিকা। সাদ্দাম-উত্তর ইরাকে শিয়া, সুন্নি ও কুর্দ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও শত্রুতা তীব্র আকার ধারণ করে। এরই পরিণতিতে আলকায়দার দলছুট সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড লেভান্ত (আই এস আই এল) ইরাকের একের পর এক শহর দখলের অভিযান চালাচ্ছে। তারা ইতোমধ্যে ইরাকের তেল রপ্তানির প্রধান পথ, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মোসুল, সাদ্দাম হোসেনের জন্মভিটে শহর তিকরিত-এর দখল নিয়েছে।

এই অবস্থায় সুন্নি উগ্রপন্থাকে পরাস্ত করতে দেশের নানা ধর্ম ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য আহ্বান করেছেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ও আমেরিকার তাবেদার প্রধানমন্ত্রী নুরি-আল-মালিকি। স্বাভাবিকভাবেই ইরাক সরকারকে সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন বিমানবাহী রণতরী পাঠানো হয়েছে ইরাক অভিমুখে। এই পরিস্থিতিতে ইরাকে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ফ্রান্সে লাগাতার ধর্মঘটে শ্রমিক-কর্মচারীরা

ফ্রান্সে ১০ জুন থেকে শ্রমিক কর্মচারীদের লাগাতার ধর্মঘট দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়েছে। এই ধর্মঘটে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব রয়েছে সে দেশের রেল শ্রমিকরা। এই ধর্মঘটের সূত্রপাত ফ্রান্সের সংসদের নিম্নকক্ষে পেশ করা একটি বিল নিয়ে। এই বিলের মাধ্যমে সে দেশের সরকার রেল-পরিবহন ব্যবস্থায় বড়সড় সংস্কার আনতে চায়। রেল শ্রমিক ইউনিয়নের আশঙ্কা, এই সংস্কার চালু হলে রেল কর্মীদের চাকুরি, বেতন, প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাদের আরও আশঙ্কা সংস্কারের নামে সরকার কর্মী সঙ্কোচনও করবে। পরিবহণমন্ত্রীর বক্তব্য, ৪০ বিলিয়নেরও বেশি ইউরো দেনার দায়ে রেল ধুঁকছে। কর্মীদের আশঙ্কা দেনার দায় সামলাতে কর্মী ছাঁটাই থেকে শুরু করে তাদের আয়ের উপর নেমে আসবে আঘাত। শুধু তাই নয় রেলের ক্ষেত্রে এই বিল কার্যকর হলে অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে এই ধরনের আইন লাগু করা হবে। সুতরাং সঙ্গত ভাবেই ফ্রান্সের সোস্যালিস্ট দলের সরকারের এই চক্রান্ত রুখে দিতেই লাগাতার ধর্মঘটের পথে নেমেছেন সে দেশের শ্রমিক-কর্মচারীরা।

২০১০ সাল থেকে এতদিনধরে টানা রেল ধর্মঘট ফ্রান্সে হয়নি। দীর্ঘ এই ধর্মঘটে সে দেশের পরিবহন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে। শুধুমাত্র প্যারিস থেকেই ৩০ লক্ষ মানুষ ট্রেনে যাতায়াত করেন প্রতিদিন। সুতরাং গোটা দেশের রেল পরিবহন ব্যবস্থার বিপর্যয়ের আকার কতটা ভয়াবহ তা বোঝা যাচ্ছে। শুধু অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ট্রেন চলাচল নয়, ইওরোপের অধিকাংশ দেশের সঙ্গে ফ্রান্সের রেল যোগাযোগ রয়েছে। ইতালি ও স্পেনের সঙ্গে রয়েছে অত্যন্ত দ্রুতগামী রেল যোগাযোগ। ইওরো স্টার সার্ভিস নামে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ইওরোপের বিভিন্ন দেশ হয়ে লন্ডন পর্যন্ত

বিস্তৃত। রয়েছে সমুদ্রগর্ভস্থ রেল যোগাযোগ, বিশেষত ব্রিটেনের সঙ্গে। ধর্মঘটে সবকিছুই অচল হয়ে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থাকেও বিপর্যস্ত করেছে। আবার রেলকর্মী ধর্মঘটের পাশাপাশি প্যারিস সহ ইওরোপের সমস্ত দেশের রাজধানীতে ট্যাক্সি ধর্মঘটও শুরু হয়েছে। রেলকর্মী ধর্মঘটের উদ্যোক্তা সি জি টি ইউনিয়ন। তাদের দাবি কর্তৃপক্ষ নানা প্রলোভন দেখিয়ে কর্মীদের ধর্মঘট থেকে সরিয়ে নিতে চাইছে। কিন্তু ধর্মঘটীদের অটুট মনোবলের কাছে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কর্মীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষ অনমনীয় মনোভাব পরিহার না করলে ধর্মঘট আরও দীর্ঘায়িত হবে।

মিশরের পরিস্থিতি খুবই জটিল

গত বছরের জুলাই মাসে মুসলিম ব্রাদারহুড পরিচালিত নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটিয়ে সামরিক বাহিনীর মদতপুষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিরোধী শক্তি বিশেষত মিশরের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি এই দলের বিপুল সংখ্যক কর্মী, নেতৃত্ব ও সমর্থককে জেলবন্দী করা হয়েছে।

গত ২৮ এপ্রিল কায়রোর ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত প্রাদেশিক শহর মিনা আদালতের রায়ে ৭২০ জন মুসলিম ব্রাদারহুড সমর্থককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের পক্ষের আইনজীবীদের কোনো বক্তব্যই আদালতে পেশ করতে দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুন এক বিবৃতিতে এই রায়ের সমালোচনা করেছেন। মার্কিন প্রশাসনের মিশরকে সামরিক সাহায্যদানের অব্যবহিত পরেই আদালতের এই রায় রাজনৈতিক মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বাড়ছে ভেনেজুয়েলায়

গত তিন মাস ধরেই উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে ভেনেজুয়েলায়। সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্য নৈরাজ্য সৃষ্টি করা। সম্প্রতি এদের হাতে খুন হয়েছেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি উগো সাভেজের ঘনিষ্ঠ ও কারাকাসের নগর পরিষদের সভাপতি ইমিজের গুটাইজা।

উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে সরকার বিরোধীদের। এর পেছনে আছে মার্কিনী মদত।

ইওরোপীয় সংসদ নির্বাচনে চরম দক্ষিণপন্থীদের জয়

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ইওরোপীয় সংসদ নির্বাচনে চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলি ভালো ফল করেছে। ইওরোপীয় সংসদ হল ইওরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক মহাদেশীয় সংসদ। ইওরোপীয় সংসদ নির্বাচনে দক্ষিণ পন্থীদের এই জয় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে সেখানকার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে। চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে মধ্য দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলগুলি সহ ইওরোপিয়ান পিপল্‌স পার্টি (ই পি পি), লিবারেল ও ডেমোক্র্যাটদের প্রগতিশীল জোট। ফ্রান্সে ইওরোপিয়ান ইউনিয়ন (ই ইউ) বিরোধী নেতা মেরিন লি পেন-এর নেতৃত্বে ন্যাশনাল ফ্রন্ট সে দেশের ৭৪টি আসনের মধ্যে ২৪টি দখল করেছে এবং মোট ভোটের এক চতুর্থাংশ পেয়েছে। চরম দক্ষিণপন্থী ও ই ইউ বিরোধী দলগুলির ভালো সংখ্যক আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ইউ কে, ডেনমার্ক, হাঙ্গেরি এবং অস্ট্রিয়াতে।

মধ্য দক্ষিণপন্থী দল ই পি পি যারা ২০০৯-এর নির্বাচনে ২৭৫টি আসন পেয়েছিল তারা ৬১টি আসন হারাতে বসেছে। সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল সোস্যালিস্টদের আসনও ১৯৬ থেকে কমে ১৮৬ হতে চলেছে। ২৮টি দেশের ই ইউ-র এই চারদিন ব্যাপী সংসদীয় নির্বাচনে ৭৫১টি মোট আসনের মধ্যে অন্তত ১৪০টি পেতে চলেছে ই ইউ বিরোধী দলগুলি।

এই ফলাফল ভোটারদের চরম হতাশার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করা হচ্ছে। ই ইউ-র অন্তর্ভুক্ত সেশগুলির মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনে ক্ষমতাসীন দলগুলির ব্যর্থতার প্রতি জনগণের ক্ষোভ ও হতাশার বহিঃপ্রকাশ এই ফলাফল। এই দিক দিয়ে সদ্য অনুষ্ঠিত ভারতের লোকসভা নির্বাচনে চরম দক্ষিণপন্থী দলের সাফল্যের মর্মবস্তুর সাথেও অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। ই ইউ-র নির্বাচনে জনগণের হতাশা প্রস্ফুটিত হয় ভোট প্রদানের হার দেখে। মাত্র ৪৩.০৯ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা, ঋণ জর্জরিত দশা, জনগণের পরিষেবা ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস—২০০৯ সালের নির্বাচনের পর থেকে এই সমস্যাগুলি সেখানকার জনগণের ক্ষোভের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এই নির্বাচনে তার সুফল ঘরে তুলেছে অতি দক্ষিণপন্থী দলগুলি।

(সপ্তম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে)

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের প্রসঙ্গ

● দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ার ফলে এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির নন পারফরমিং অ্যাসেট বা অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, এই মুহূর্তে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি কিছুটা চাপের মুখে রয়েছে।

● এই অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য তাদের মূলধনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

● ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া 'পি জে নায়েক কমিটি' গঠন করে।

● পি জে নায়েক কমিটি ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সমস্ত সমস্যার একটিই দাওয়াই বাতলেছেন, তা হল সরকারের অংশগ্রহণ হ্রাস এবং সরকারী অংশীদারিত্বের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে ধীরে ধীরে বেসরকারীকরণের পথে ঠেলে দেওয়া।

● যদিও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব পি জে নায়েক কমিটিই যে প্রথম করল তা নয়। ২০০৭ সালে পার্সি মিস্ত্রি কমিটিও একই সুপারিশ করেছিল। যদিও এর পরে ঐ বিষয়ে আর তেমন কিছু শোনা যায়নি।

● পি জে নায়েক কমিটির মত হল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের ভঙ্গুর আর্থিক অবস্থা এবং ঝুঁকি সামাল দেবার অক্ষমতার মূল কারণ হল পরিচালনা ব্যবস্থার ত্রুটি ও দুর্বলতা।

● কমিটির মত ঐ ত্রুটি দূর করার প্রধান উপায় হল, পরিচালন ব্যবস্থা থেকে সরকারের নিজের দূরত্ব তৈরি করা এবং মালিকানা অংশীদারিত্বের পরিমাণ ন্যূনতম করে ফেলা।

● এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য কমিটি যে সুপারিশগুলি করেছে, সেগুলি হল—

(i) 'ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজেশন অ্যাক্ট' এবং 'স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' বাতিল করা এবং সমস্ত ব্যাঙ্ককে কোম্পানি আইনে কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্ত করা।

(ii) সরকার তার ব্যাঙ্কের শেয়ারকে একটি ব্যাঙ্ক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির হাতে তুলে দেবে। এইভাবে ব্যাঙ্ক পরিচালনায় সরকারের দায়িত্ব ব্যাঙ্ক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানির উপর ন্যস্ত হবে।

(iii) পর্ব (১) ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাঙ্ক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি কাজ শুরু করছে, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়ে একটি ব্যাঙ্ক বোর্ড ব্যুরো গঠন করা হবে, যারা চেয়ারম্যান, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর সহ সমস্ত ধরনের নিয়োগের বিষয়ে পরামর্শ দেবে।

(iv) পর্ব (২) ঃ ব্যাঙ্ক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি কাজ শুরু করলে, পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব বি আই সি-র।

(v) পর্ব (৩) ঃ এই পর্বে ব্যাঙ্ক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন ব্যাঙ্ক বোর্ডকে হস্তান্তর করবে। একই সাথে বিআইসি তার অংশীদারিত্বের পরিমাণ ৫০%-এর নীচে নামিয়ে আনবে, যাতে 'কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স কমিশন' ও 'তথ্যের অধিকার আইনে'র (আরটিআই) আওতার বাইরে চলে আসতে পারে।

(vi) পি জে নায়েক কমিটির সুপারিশে সুস্পষ্টভাবে বলা না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে যে ইঙ্গিত রয়েছে তা হল ব্যাঙ্ক ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে সরকারী অংশীদারিত্বের পরিমাণও ধীরে ধীরে ৫০% নীচে নামিয়ে আনা হবে। যার অর্থ হল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের বেসরকারীকরণ।

উপরোক্ত সুপারিশগুলি করার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কমিটি যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছে তা বহুক্ষেত্রেই বিতর্কিত। যেমন—

(ক) বলা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের পারফরমেন্সের মান বেসরকারী ব্যাঙ্কের তুলনায় খারাপ। যদিও তথ্য সে কথা বলে না। কমিটিও তার বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনো বিশদ তথ্য হাজির করতে পারেনি। বিপরীতে এই বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজের ফলাফল প্রমাণ করে, ভারতে ব্যাঙ্কের পারফরমেন্স মালিকানা-নিরপেক্ষ বিষয়।

(খ) রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের বোর্ডগুলি কোনো কাজ করে না। কিন্তু একথা বলা হয় নি যে বেসরকারি ব্যাঙ্ক বোর্ডগুলিরও একই হাল। সরকারী অথবা বেসরকারী যে কোনো ব্যাঙ্কের বোর্ডই মোটামুটিভাবে অকেজো। বিশ্ব আর্থিক সঙ্কটের সময় দেখা গেছে, ইওরোপের বিভিন্ন বৃহৎ বেসরকারী ব্যাঙ্কের বোর্ডগুলি চূড়ান্ত হতাশাজনক ভূমিকা পালন করেছে।

(গ) নায়েক কমিটির সুপারিশ হল কিছু পেশাদার দক্ষ প্রশাসককে বোর্ডগুলির সাথে যুক্ত করলেই এগুলির কাজের মানের ব্যাপক উন্নতি ঘটবে। এটিও অত্যন্ত সরলীকৃত সুপারিশ। কারণ যুক্তরাজ্যের বৃহত্তম বেসরকারী ব্যাঙ্ক 'রয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ স্কটল্যান্ডের' পরিচালন বোর্ডে বাঘা বাঘা পেশাদার প্রশাসকদের যুক্ত করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ঐ ব্যাঙ্ক বিপর্যয় ঠেকাতে পারেনি।

পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের বোর্ডগুলিতেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দক্ষ প্রশাসকদেরই নিয়োগ করে। এমন নয় যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের বোর্ড গুলিতে সমস্ত অযোগ্য লোকেরা বসে রয়েছেন।

(ঘ) নায়েক কমিটির আরও একটি অভিমত হল, বোর্ড পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সরকারকে এর থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। নায়েক কমিটির এই অভিমত বাস্তবসম্মত নয়, কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের প্রধান অংশীদারিত্ব সরকারের। সরকার সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। সুতরাং সরকার ব্যাঙ্ক-বোর্ড পরিচালনায় নাক গলাবে না, এই বক্তব্যের কোনো রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।

১৯৯০-এর দশকে বিজয় কেলদার কমিটিও একই ধরনের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু সেই সুপারিশ দিনের আলো দেখে নি। ব্যাঙ্কগুলিকে এখনও সরকারী সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কবোর্ড পরিচালনায় সরকারের কোনো ভূমিকা থাকবে না—এই বক্তব্যের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

(ঙ) ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের আরও একটি কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলিতে বেতন কাঠামো অনেক উন্নত। প্রাথমিকভাবে এই বক্তব্যের সত্যতা রয়েছে বলে মনে হলেও, পেনশন বেনিফিট সহ কর্মী পিছু ব্যাঙ্কের দায়বদ্ধতা হিসেব করলে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাঙ্কে খুব বেশি পার্থক্য নজরে পড়বে না।

(চ) কমিটির আরও একটি অভিমত হল, ব্যাঙ্কের সর্বমোট মূলধনে সরকারী অংশীদায়িত্ব ৫০%-এর ঊর্ধ্বে রাখতে হলে, যে পরিমাণ অর্থ সরকারী তহবিল থেকে দেওয়া প্রয়োজন (প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকা) তা নাকি সামর্থ্যের বাইরে। কিন্তু বাস্তবে ৩০,০০০ কোটি টাকার অঙ্কটি খুব বড় হলেও, সরকারের সাধ্যের বাইরে নয়। □ **সুমিত ভট্টাচার্য**

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।